চক্র-বক্র

বাণী রায়

শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন,
ভবানীপুর
কলিকাতা-২৫

প্রকাশক :
রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২, পণ্ডিতিয়া টেরেস,
বালিগঞ্জ,
কলিকাতা-২৯

মুদ্রণ :—
এ্যাথেনা প্রিণ্টার্স
১২৪এ, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : *চিত্ত দাস*

প্রথম সংস্করণ :— ১লা জানুয়ারী ১৯৬৩

স্নেহপ্রতিমা

শ্রীমতী লিপি রায়

কল্যানীয়াসু

এই লেখাগুলি 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে একটি সিরিজ হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। 'চক্র-বক্র' নামটি প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন এবং তাঁরই উৎসাহে আমি লিখেছি।

এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। অনুজপ্রতিম শ্রীমান অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ যত্নসহকারে 'চক্র-বক্রের' প্রকাশ সম্ভব করেছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

বাণী রায়

সূচী

চালের চাঁদোয়া	১	ভূত	৮২
বিক্ষত নায়ক	৭	আটক চক্র	৮৯
আমার বন্ধু ব্যানার্জি	১১	দেহের শেষ রক্তবিন্দু	৯৪
অথ বিবাহ ঘটিত	১৮	সভা	৯৮
বিনে ভোজে নিমন্ত্রণ	২৫	ধর্মও যৌনতা	১০৭
খাই খাই	৩০	শ্রম ও শ্রমিক	১১৪
অতিথি	৩৬	বিড়াল	১১৯
চা-কফি সুগার	৪২	ঈর্ষাপরায়ণ চোখে	
ভিড়	৪৮	নার্সারি স্কুল	১২৪
ধর্ম	৫৪	ন্যাকা কুকুর	১২৯
সময়	৬১	সেই থিয়েটারের	
এবার উন্নতির কথা	৬৬	দিনগুলি	১৩৪
কলেজ স্ট্রীট	৭১	মোশান মাষ্টার	১৪০
যুগযন্ত্রণা	৭৮	পুরনো কলকাতা	১৪৪

"ভাই মঞ্জুশ্রী, কি চমৎকার চাঁদোয়াটা, দেখেছ নাকি? শাদা-লাল কাপড়ের পদ্ম কেটে দিয়েছে।"

"মন্দ নয়। এ আর কি? আমার পিসতুতো দাদার বিয়েতে যে চাঁদোয়া লাগানো হয়েছিল, ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে থাকার মত। ঝক্‌ঝকে জড়ির খোপ্‌না ভেলভেটের চালি থেকে ঝুলছে—"

আমাদের আর ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে চাঁদোয়াটার বিশদ ব্যাখ্যা শুনে লাভ কি? কোন্ হিল্লে হবে? তার চেয়ে চলুন ওধারে, লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ বিয়েবাড়ী।

এমন চালের চাঁদোয়া অন্য কোথায় ঝোলে? মাথার উপর ঝুলছে সদা সর্বদা। এই বুঝি পড়ে পড়ে। 'গেল গেল' রব উঠেছে, আবার সামলে নিচ্ছে। কখনও বা ফেঁসেও যাচ্ছে।

পাঠক, একটি বিবাহবাটীর কথা স্মরণ করুন। সম্পন্ন আধুনিক গৃহ। ছবির উপযোগী ফ্রেম রচনা হয়েছে নিঃসন্দেহে। বাইরের ফটক চক্রাকারে আলো দিয়ে সাজানো। গাছগুলো পর্যন্ত আলো পড়ে মশালচীর সার্ভিস দিচ্ছে। নীল চন্দ্রাতাপের নীচে আনন্দের

হাট বসেছে। কৃত্রিম জলপ্রপাত উর্ধ্বে নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ছে মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করে। এক কোণে শ্বেতাঙ্গ বাজিয়ে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে, অবকাশে দাড়ি নেড়ে মিঞাসাহেব ধরেছে সানাই। বীরত্বে, কারুণ্যে মাখামাখি। আহা! আহা!

লাল কাঁকড়ের পামাকীর্ণ পথে মহামূল্য শাড়ীলোটানো মহিলারা ধীর, ভণ্ডভাবে অগ্রসর হচ্ছেন আড়চোখে এ ওর বেশ দেখে দেখে। হীরার বালা, মোতির মালা আলোর খেলা দেখাচ্ছে। চম্পক বেনারসীর সঙ্গে নাইলনের শাড়ী মিশে যাচ্ছে, তাঞ্জোরের সঙ্গে সবুজ কাঞ্চিভরম। রূপ ও রূপার জয়ধ্বজা উড়ছে। ওহো! ওহো!

ওখানে যে রূপ ও রূপোর দেখা পাওয়া যায়, কতটা অকৃত্রিম, সন্দেহ জাগে মনে।

রূপসী, অধুনা হেয়ারড্রেসারের কেশসজ্জাপরিশোভিতা না হয়ে গাড়ী থেকে নামেন না। মুদির টাকাটা পরে দিলেই চলবে, না হয় এ-সপ্তাহ পুরো র‍্যাশন তোলা বাদ দেওয়া যাবে। অতটা লাগে না, চাকর-বাকরের পেটভরানো মাত্র। কিন্তু সেলুনে যেয়ে চুল বেঁধে না এলে সভ্যসমাজে হাজিরা দেওয়া যায় না। স্বামীর বড়কর্তা ও বাড়ীর আত্মীয়। তিনি ওরিয়েণ্টাল ছাঁদ পছন্দ করেন। অতএব ফিরিঙ্গি হেয়ার-ড্রেসার গলদঘর্ম হয়ে মাথার ওপরে মিশরের পিরামিড নির্মাণ করে। এক কোণে কিম্ভূত-চেহারার রূপোর একটা ফুল আটকে দেয়। মাথার ভারে শ্রীমতী নড়াচড়া করতে পান না। আহারে সুখ থাকে না। আড়ষ্ট হয়ে পাখার নীচে বসে পেখম-মেলা ময়ূরের মত নিজেকে মেলে রাখেন।

আমার এক প্রাচীনপন্থী সহপাঠিনি একদা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, 'স্বামীর পার্টিগুলোতে যেতে মোটে ইচ্ছা করে না, ভাই। ভাল জামাকাপড়ে হয় না। মেকাপ্ ব্যবহার না করলে ওরা মানুষ মনে করে না।'

তিনি এখন সমুদ্রপারের দেশবাসিনী। হয়ত ওই নিরালঙ্কৃত মুখই সেখানে আদৃত হয়েছে।

তিনি এদেশে থাকলে বলতাম, 'তোমার দিন গেছে। এখন মেকাপে কিছু হয় না, হেয়ার-ডু ছাড়া তুমি মানুষ নও।'

কাপড়চোপড়ের ঝলমলানি কমেছে। গ্রীষ্মকালে শাদা টাঙ্গাইল ফ্যাশন। কিন্তু দু-চারটে মানানসই গহনা চাই, প্রেফারেব্‌লি মুক্তা। না থাকে ধার করে আনো।

তবে সজ্জিত চুলটি চাই। মানাক-না-মানাক একখানা চুবড়ি মাথায় বেঁধে যেতেই হবে। চুল দেখব না মুখ দেখব?

একরাত্রের জন্য পাঁচ-দশ টাকা খরচে এদের আপত্তি নেই, অথচ আহার থেকে বাচানো হচ্ছে। অ্যানিমিয়ার শিকার হওয়াও ভালো, তবু হেয়ার-ডু চাই।

অনেকে নিউমার্কেটের কেনা চুলে নিজেরা খেটে-খুটে একটা কিছু তৈরি করেন। কেশ উঁচু করে রাখা, যাতে বিয়েবাড়ীর চালের চাঁদোয়ার মাথাটা ঠেকে।

চুল খুলে মুখ ধুয়ে এঁরা কেমনটি হবেন বলা শক্ত। যেটা দেখছি চুলে, রং-এ, বেশে, সেটার কতটা অকৃত্রিম?

তারপরে বিয়েবাড়ী আছে যৌতুক। এখন যে যত যৌতুক সাজিয়ে লোককে দেখাতে পারবেন, তাঁর তত গৌরব। আগে পাত্র দেখতে হিড়িক পড়ে যেত এখন যৌতুক দেখতে।

একবাড়ি গেছি, কন্যার মাতা, 'এদিকে আসুন, এদিক আসুন' বলে আপ্যায়িত করলেন মহিলাদের বসবার জায়গায় না বসিয়ে।

'ওদিকে বর বুঝি?'

'না, বর পেছনের ঘরে বসেছে। এদিকে যৌতুক সাজানো হয়েছে।'

যৌতুক বটে। খাট-আলমারী ড্রেসটেবিল ইত্যাদি আছেই। রেফ্রিজারেটর, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টার, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি

না হলে আবার দিল কি ছাই ?

আসবাবও প্রাচীনপন্থী হলে আর চলে না। আঁকাবাঁকাতেড়া হয়ে গায়ে নানা ধরনের পালিশ। কখনও বা তিব্বতী প্যাটার্ণে বড় বড় পাথরের পদক বসানো। এখন বড় দোকানে যেয়ে দামী আসবাব কিনে দিলেই চলে না। মাথা খাটিয়ে ডিজাইন বার করে অর্ডারমাফিক কতকগুলি অস্বস্তিকর জিনিষ দেওয়াই রীতি।

কে কত দিতে পারে ? এই একটি রাত্রে দশজনের চক্ষে কন্যাকর্তার সামাজিক মান নির্ণয় হয়ে যায়। তত্ত্ব দেওয়া প্রথা থাকলে, বরকর্তারও।

এক একজন মহিলা কন্যাজন্ম থেকে সামগ্রী সংগ্রহে লাগেন। কাশ্মীরে গেলে কাশ্মিরী সামগ্রী, দিল্লী গেলে দিল্লীর সামগ্রী। একদিনে তাক লাগিয়ে দেবেন সকলকে।

ঘরভরা আসবাব, চাঁদোয়ার নীচে চপ্-কাটলেট—কিন্তু কত-জনের বাড়ী মরগেজ পড়ে, কতজনের ইনসিওরেন্স পেড-আপ হয়, কতজনকে ঋণের ধান্দায় ঘুরতে হয়, আমরা জানি না। আমরা শুধু রৌপ্যের চাকচিক্যে বিমূঢ় থাকি।

বর এখন দর্শনীয় ব্যক্তি নন। শ্রোতব্য ব্যক্তি মাত্র। অর্থাৎ বরের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ, কন্যপক্ষ তার চাকুরির ওজনটা শুনিয়ে দেন শুধু। এখানে একটা কথা কিঞ্চিৎ অবান্তর হলেও জনান্তিকে বলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। (বরমশাই, বিয়ের কিছুদিন আগে রূপচর্চা করবেন অতি অবশ্য। আপনি পাত্রীর রূপ যাচাই করে নেন, তারপরে যে আপনার যাচাই চলে সহস্র কোটি অক্ষিতে, জানেন কি ?)

বিবাহবাটী এখন সর্বপ্রকার চাঁদোয়া, বিশেষতঃ চালের চাঁদোয়ার সর্বপ্রধান ক্ষেত্র।

চাল আবার মধ্যে মধ্যে ডাল হয়ে যায়, যাকে আপনারা "Dull" বলেন।

একটা বিয়েবাড়ী দুই মহিলা আহারের ডাকের আশায় মুখে নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে গল্পগুজবে সময় কাটাচ্ছেন। প্রথমা সম্প্রতি কন্যার বিবাহ দিয়ে পরিতৃপ্ত, সেই ঘটনা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নিধি। স্বাভাবিকতঃ গল্প ছোটে সেদিকে। দ্বিতীয়াও কিছু পূর্বে কন্যার বিবাহে কন্যাদায়মুক্ত।

প্রথমা : 'ফুলশয্যার দিন বেয়াই-বাড়ী আমার ডেকরেটার যেয়ে ঘর সাজিয়ে এল। ফুলের মশারি গেঁথে দিল। আমি বিল মেটালাম।'

দ্বিতীয়া : 'তাই করতে হয়। আমিও পাঠিয়েছি।'

প্রথমা : (কান না দিয়ে) 'কি অদ্ভুত সাজিয়েছিল, ভাই, দেখে ঘরটা চিনতে পারিনে। দু'শো টাকা বিল ধরল। বোঝ, দু'শোটি টাকা আমাকে দিতে হল।'

দ্বিতীয়া : (উদাসভাবে) 'আমার আবার ঠিক উল্টোটি। সারা ঘর ঘিরে ধুপের গোছা বসিয়ে, ফুলের পিলার বানিয়ে এলাহি কাণ্ড করে তুলল আমার ডেকরেটার যেয়ে। কিন্তু আমার কাছ থেকে একটি পয়সা নিল না। বলল, 'আপনার বেয়াই এত নামকরা লোক যে ওঁর বাড়ী সাজিয়ে আমাদের গৌরব।' কিছুই খরচ লাগল না আমার।'

প্রথমা মহিলা একেবারে কর্তিত হয়ে সোফায় কাটা সৈন্যের মত ছড়িয়ে পড়লেন।

আমি মুখে রুমাল চেপে কাশির ধমক তুলে জলের সন্ধানে যাচ্ছি বলে উঠে এলাম।

অতঃপর ঠেলাঠেলি, খেতে ডাকে না কেউ। যে পারে ধেয়ে যেয়ে পাতায় বসছে। সময় ভাল না, বাড়ী ফেরা দরকার তাড়াতাড়ি। অনেকে দূরের যাত্রী, কাচ্চাবাচ্চাও সঙ্গে। না খেয়ে গেলে বাড়ীতে এত রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অথচ যাঁরা সারা বাড়ী ফুলে-মালায়, আলোয় এমন সাজিয়েছেন অতিথি-আপ্যায়নে উদাসীন কেন? অনেকে না খেয়ে যাচ্ছে, এঁরা

বিচলিত হচ্ছেন না। বরঞ্চ সেটাই যেন স্বাভাবিক। বর্তমান গতির মেলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা মানে উপঢৌকন ও এক গ্লাস সরবৎ যথেষ্ট।

যৌতুক সাজিয়েছেন প্রচুর। অথচ দালদায় ভাজা ঠাণ্ডা লুচি, বিস্বাদ মিষ্টান্ন একবার দিয়ে অদৃশ্য পরিবেশক। যা পেলাম খেয়ে গেলাসে হাত ধুয়ে চেয়ে-চিন্তে পান নিয়ে বার হবার সময়ে মনে পড়ল সেকালে কর্মকর্তার সবিনয় অনুরোধ, 'জায়গা হয়েছে, আপনারা একটু কষ্ট করে এধারে আসুন।'

আমার পিতামহ হাজার হাজার লোকের আহার অন্তে তবে নিজে খেতে বসতেন দেখেছি। তাঁর ধীবর প্রজাটির পাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার কি চাই, পেট ভরেছে কিনা প্রশ্ন করতেন।

আর, আমরা তিনশো' লোককেই খাওয়াতে হিমশিম্। অবশ্য স্থানের অকুলান, অনটনের যুগ ইত্যাদি আছে।

কিন্তু তাহলে এত লোককে বলা কেন? যতটুকু পারি, ভালভাবে ততটুকু করলেই হয়। সর্বাঙ্গে গহনা, কন্যার ঘরভরা যৌতুক, বড় চাকুরে পাত্র দেখবে কে তাহলে?

চালের চাঁদোয়া ঝুলবে কোথায়? কিন্তু আছে, ব্যতিক্রম আছে এখনও। যেখান থেকে মনের সঞ্চয় আহরণ করে আনা যায়। সেখানে চাঁদোয়া ঝোলে না, থাকে মাথার উপরে মহৎ আকাশ।

আমার বিচারে (কাব্য শাস্ত্রের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে নয়) নায়ক তিন প্রকার।

অক্ষত নায়ক, ক্ষত নায়ক ও বিক্ষত নায়ক। অক্ষত নায়ক হচ্ছেন সেই নায়ক, যিনি পঞ্চশরের পঞ্চবান নির্বিবাদে প্রতিহত করে থাকেন। শোভনাঙ্গী তরুণীকুলে তিনি বিচরণ করেন নিজের হৃদয়টি মুঠোয় চেপে ধরে। হারাবার ভয় থাকে না। বিবাহে তিনি সুবিধাবাদী, ঘটকালি করে বিবাহে অরুচি নেই, যদি সেই বিবাহ লাভজনক হয়। নিজেও কন্যা মনোনয়ন করে থাকেন, যদি অর্থ ও সামর্থ্যে পিতৃকুল গৌরবধন্য হয় কন্যার। কখনও বা জাতিকুল অটুট রেখে ভুবনবিজয়িনী রূপসীকে কুক্ষিগত করে থাকেন।

একাধিক নায়িকা এঁর জন্য হা-হুতাশ করলেও ভ্রমেও উক্ত ব্যক্তির নৈশ-শয়নের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয় না। নায়িকাদের নিশ্বাসে কৃত্রিম ঝটিকা সৃষ্ট হ'লেও তাঁর একটিও নিশ্বাস মাপ ছেড়ে ঈষৎ দৈর্ঘ্য পায় না। অবিচলিত চিত্তে তিনি নিজের মত ও পথ আঁকড়ে থাকেন।

ভীষ্মের সমান নায়ক দেখেছি বই কি, পুরোপুরি অক্ষত নায়ক। তাঁদের ভালবাসার ক্ষমতা কম। চরিত্র বজায় রাখবার দোহাই পেড়ে অক্ষত থাকেন।

আবার অক্ষত নায়ক দেখেছি, আগে যা বলেছি ঠিক তেমনি। আমার এক বাল্যবন্ধু এমনটি ছিল। ছেলেটির দুর্নাম-সুনামে তৎকালীন মহিলাসমাজ মুখরিত। সুনাম ওর রূপের, সাক্ষাৎ কন্দর্প বললেও হয়। দুর্নাম ওর মহিলাঘটিত চপলতা হেতু। আমি বলেছিলাম: 'ওহে, এমন করে মেয়েদের তুমি বাড়াও বা কেন, ছাড়াও বা কেন?

শ্রীমান আমাকে নাতিদীর্ঘ বাচনে জানাল, "মেয়েরা সাধারণতঃ মুখ খুলতে পারে না। যদি কোন মেয়ে নিজে থেকে এগিয়ে আসে তবে তাকে ফেরানো অধর্ম।"

ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মতত্ত্ব শুনে আমি বাক্যাহত। এক বিখ্যাত ধর্মগুরুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি নিজের বহু বিবাহের স্বপক্ষে নজীর দিতেন,—'সমর্থ পুরুষ বহুনারীকে গ্রহণ করবে। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ তাই।'

বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা পত্নী সংখ্যায় তাঁর শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার গোপনারীর সমান না হলেও সাধারণ মনুষ্যের কল্পনানীত।

ক্ষত নায়ক হচ্ছেন একেবারেই যিনি ঘায়েল হয়ে পড়েন। অতঃপর হয় আত্মহত্যা, নয় আত্মগোপন, নয় আত্মবিসর্জন। আত্ম-বিসর্জন মানে অন্য একটি বরনারীকে মাল্যদান।

চাঁদের দিকে চেয়ে হাহুতাশ, প্রেমের গান শুনে মুখবিকৃতি আজন্ম পাষাণীর বেদীমূলে পূজা জপতপ হোম, দেশান্তরী হওয়া, পরীক্ষায় ফেল করা, চাকুরিস্থলে বীতরাগ, কখনও বা চাকুরি খোওয়ানো, কঠিন রোগে পতন, কখনও পপাত চ মমার চ;—ক্ষত নায়ক ইত্যাদি কর্মে রত থাকেন।

আবার মধু অভাবে গুড়ের মত নবোঢ়াকে গৃহেও আনেন কেন? না, ভুলে থাকা।

কখনও প্রেয়সীর সাদৃশ্য দেখে, কখনও বা অসাদৃশ্য দেখে ক্ষত নায়ক পাত্রী নির্বাচন করে থাকেন। তারপর, They lived happily afterward's.

কিন্তু সর্বাপেক্ষা রম্য হচ্ছেন বিক্ষত নায়ক। 'বি' অর্থাৎ বিশেষরূপ বা আধিক্য সূচক উপসর্গ। এই নায়কের দেহে প্রেমের টীকা প্রবেশ করে তাঁকে বারম্বার রক্ষা করে। এত বেশীবার প্রেমে ক্ষত তিনি, যে সেটাই তাঁর টীকা।

এই নায়কের মটো :—

'তুফানে পড়িলে পরে ছেড়োনাক হাল,
আজিকে বিফল হ'লে হ'তে পারে কাল।'

নায়ক অনায়াসে অবাধে প্রেমে পড়েন, যত্রতত্র। মনোনীতার জন্য অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন অকাতরে। Love's—errands কথাটা যেন এ'র জন্যই সৃষ্টি।

কোন মহিলার ক্ষণ দৃষ্টিক্ষেপ তাঁর কাছে মন দেওয়া। কেউ যদি হেসে কথা বলে, নায়ক ফেঁসে যান। কোন স্থানে আঘাত পেলে হাত পা এলিয়ে ভাবেন : আর নয়। প্রেমে সুখ নেই সন্ন্যাসী হব। কিন্তু আবার কয়েক দিনের মধ্যে যে কে সেই।

আমি একজন বিক্ষত নায়ককে চিনতাম।

উক্ত ভদ্রলোকের প্রেম ইন্‌টারন্যাশানাল। স্বদেশে, বিদেশে সর্বত্র তিনি নায়ক। যখন যাঁকে আশ্রয় করেন, সেই মহিলার জন্য তিনি কি না করেন। তাঁর বাজার করে দেওয়া, তাঁকে ডাক্তার-বাড়ী নিয়ে যাওয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁর থিসিস্-লেখায় সাহায্য করা, টাকা পাইয়ে দেওয়া,—একদম আদর্শ প্রেম।

তাঁকে দোষ দেওয়া যেতনা, তিনি প্রত্যেকবারেই হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। কিন্তু প্রেম চপল। কোন এক পক্ষের দোষে তিনি বিফল হয়ে ফিরতেন।

নানা দেশবিদেশ ঘুরে ভদ্রলোক অবশেষে আমাদের শহরে এসে ঠেকলেন।

আর অমনি এক ঝানু মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেলেন স্বীয় স্বভাবানুযায়ী।

তারপর আর তাঁর দশা চেয়ে দেখা যায় না, যায় না। শ্রীমতীর মায়ের দাঁততোলা, বাবার প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়া ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে ফিউজ সারানো কত কি ওকে করতে হত। নায়িকার কুকুরকে হাওয়া খাওয়ানো, লাইব্রেরির বই বদল ইত্যাদি ছিলই তো।

একদিন অসময়ে রসময় বিক্ষত নায়ক আমার গৃহে হাজির হয়ে সোফার বুকে এলিয়ে পড়লেন।

তাকিয়ে দেখি কেমন যেন কালিমারা মুখ, গলার টাইটাও বেঁকে গেছে।

নিজেই বলতে শুরু করলেন, "আর ভালো লাগে না। ভাবছি কোথাও চলে যাই এদেশ ছেড়ে।"

'কেন? কেন? আপনার তো অনিমা তরফদার আছে।" আমি হেঁসে বললাম।

ক্ষেপে উঠলেন তিনি, আর কাঁহাতক পারা যায়? নিত্যি নতুন কাজের ফরমাস। তাও সয়ে ছিলাম। হঠাৎ বলে বসল যে, 'আমি একজনকে ভালবাসি, তার সঙ্গে আমার বিয়েটা ঠিক করে দিন।' বুঝুন, ফরমাসের বহরটা? আর সহ্য হয়?"

এবারে আমার হাসির শব্দে প্রতিবেশীদের সবগুলো জানালা খুলে গেল।

—:::*:::—

ভাই দি ওয়ে, আমি কিন্তু কাউকে মীন করছি না। আমার দুর্ভাগ্য যে যা কিছু লিখি সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ তাঁদের প্রতি কটাক্ষপাত খুঁজে পান। জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা না করে নামের মিল খুঁজেই সবাই খুন।

'মাধুরী' লিখলে মণিকা ধরে নেন ওঁকেই প্রচ্ছন্ন নামেই চিত্রিত করা হয়েছে। 'মণিকা' নাম দিলে মাধুরী ভাবে, একটু নামের অদল বদলে ওকেই স্মরণ করেছি।

অতএব পাশ্চাত্য আধুনিকীর প্রথায় বন্ধুবর্গকে পদবী ধরেই ডাকি। 'ব্যানার্জি', 'মুখার্জি', 'দত্ত', 'মিত্র' ইত্যাদি।

আজ বলতে চাই কোনও এক ব্যানার্জির কাহিনী। কিন্তু 'আমার বন্ধু, লিখলেও ধরে নেবেন না যেন, সে আমার সত্যি সত্যি বন্ধু।

ব্যানার্জি একটি জীবন-গবেষক।

পূর্বে আমিও ছিলাম কিছুদিন, ব্যানার্জির ওই বিশেষ বিষয়টির। গবেষণার বিষয়বস্তু বৈবাহিক।

তবে ব্যানার্জি ও আমার Approach ছিল ভিন্ন। ব্যানার্জি নিজের বিবাহের গবেষণা করত, আমি করতাম অন্যের।

ব্যঙ্গরসিক সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী আমাকে একদা বলেছিলেন, "বিয়েটা অত সিরিয়াসভাবে নিচ্ছ কেন? যে-কোন একটা বিয়ে অতি সহজভাবে করে ফেললেও তো পার।"

অতঃপর আমি বিবাহ ব্যাপারটি সিরিয়াসভাবে নিইনি আর। নিজের ক্ষেত্রে অবশ্য নয়, অন্যের ক্ষেত্রে। নিজের ক্ষেত্রে যদি নিতে পারতাম তবে আমার অন্যরূপ তো দেখতে পেতেন আপনারা।

তখন আমি কলম না পিষে অন্যকে পিষতাম। জাঁতাকলে পিষে আদায় করতাম রজতচক্র বা কাগজের তাড়া।

আমি লোকজনকে একা দেখতে পারতাম না আগে। দেখলে বিষণ্ণ হয়ে ভাবতাম : এর একটা সঙ্গী জুটিয়ে দেওয়া যাক। বিবাহ অতি সহজসাধ্য কর্ম।

ফলে চেনাজানার মধ্যে কয়েকটি বিয়ে হয়েও গেল। একদিন বসে কলম পিষছি, হাজির আমার বান্ধবী মিত্র (নাম করছি না একেবারে)।

দু'হাত কোমরে রেখে, ঘূর্ণমান রক্তচক্ষে মিত্র বলল, "আমার এমন উপকারটা করতে কে বলেছিল? এমনি বদ্‌রাগী লোকের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছো যে বলা যায় না। অন্য কেউ হলে ডিভোর্স হয়ে যেত।" আমি হতাশস্বরে বললাম, "ডিভোর্স করছ না কেন?" "তাহলে খাব কি শুনি? বুড়ো বয়সে অন্য লোক জুটবে না। সান্ধ্যভ্রমণের নাম করে কোথায় যায়, জানি না। আমি কি ওর ভ্রমণসঙ্গী হতে পারি না?"

মেয়েটিকে ভদ্রলোকের অনুপস্থিতির সময়ে টেলিফোনে ধরলাম "রোজ সন্ধ্যায় একা-একা কোথায় যাও?" উত্তর এল, 'সর্টহ্যাণ্ড-টাইপিং শিখতে।"

'শিক্ষার সব কিছুই ভালো। কিন্তু স্বামীকে বলে যাওনা কেন?'

"আমার উদ্দেশ্য বুঝলে ও সাবধান হবে।"

"কী বলছো!"

আমি অগাধ জলে তলিয়ে গেলাম।

"আমি কাজ শিখে ওরই অফিসে চাকুরি নেব কিনা।"

"ও তো প্রচুর রোজগার করে। তোমার আবার কি দরকার?"

"ওকে চোখে চোখে রাখা।"

তারপর থেকে একদম ঘটকালি ছেড়েছি। দেখলেন তো, আমি কত কাঁচা ঘটকালিতে? অবশ্য সেকথা লিখিতভাবে জানাবার প্রয়োজন নেই। জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমি নিজে।

ব্যানার্জির মতে: 'Self help is the best help' ও 'Charity begins at home' সুতরাং স্বাবলম্বী হয়েছে সে। আমার মত বহিরঙ্গণে কৃপা বিতরণ না করে কৃপার সঞ্চয় নিজের ঘরে অর্থাৎ নিজের প্রতি বর্ষণ করে থাকে।

মধ্যে মধ্যে গবেষক ব্যানার্জি আসে। ওর কথায় নানা বস্তু ধরতে পারি অভিজ্ঞতার পরিধি-সীমানায়। ব্যানার্জির বয়স হয়েছে। তার আবার বয়সে বড়, নিদেনপক্ষে সমবয়স্ক পাত্র না হলে চলবে না। ব্যানার্জি উচ্চশিক্ষিত, তদুপরি উত্তম চাকুরিয়া।

সে চায় পদস্থ পাত্র সর্বদিকে ব্যানার্জির চেয়ে বড়। এত বয়সে অনূঢ় পাত্রের সংখ্যা বিশেষ অল্প। হাতের মধ্যে পাওয়া শক্ত। পদস্থ রোজগারী ব্যক্তির অনেকক্ষেত্রে দুস্থ আত্মীয়স্বজন থাকে। অনেক সময় অবিবাহিতা ভগ্নী, মাতা ইত্যাদি থাকেন।

জননী যদি পাত্রী মনোনয়নে নামেন, নিদারুণ পরিস্থিতি। পুত্রের পাশে দাঁড়াবার মত পাত্রী পান না। যদি বা পান, যৌতুকের চিত্র মনে ধরে না।

"আমাকে কিচ্ছু দিতে হবে না, তবে দশজন আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, ওদের মধ্যে বার করার মত সামগ্রী হয় যেন। প্রণামীগুলো অন্য বাড়ী যাবে, সেগুলো ভালো হওয়া চাই।"

পিতা বলেন "নগদ এক পয়সাও চাই না। কোন দাবী নেই।"

সুন্দরী কন্যার দরিদ্র পিতা আনন্দে বিহ্বল হয়ে বিবাহ স্থির

করেন। হাতে একখানা লম্বা ফর্দ আসে ত্যাগী বরকর্তার দান।

"কি করব, ভাই, বাড়ীর মেয়েরা ছাড়ছেন না। মেয়ে বলছে, দাদার বিয়েতে খাটবিছানা দেবে না? তা, আমাকে টাকা দিতে হচ্ছে না তো, এগুলো—, মেয়েদের আবদার।"

দরিদ্র কন্যাকর্তা ছল্ ছল্ চক্ষে বাড়ী মরগেজে চড়াতে ছোটেন কিম্বা ধনী আত্মীয়ের স্কন্ধারূঢ় হয়ে পড়েন।

নগদ দেওয়া বরঞ্চ ভাল, যৌতুক সাজানোর দায় কমে যায় সেখানে। এ এক নতুন খেল।

আমি ব্যানার্জির গবেষণায় বলি, "কিন্তু তুমি চাকুরে। মাস গেলে মোটা টাকাটা ওদের ঘরে উঠবে তো। তোমার ক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রশ্ন নেই।"

"হুঁ!" নাকের মধ্য দিয়ে তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ পাঠিয়ে বন্ধু ব্যানার্জি বলে, "তুমিও যেমন। বই-খাতার জগৎ নিয়ে ক্যাৎস্ অফ্ লাইফ্ ভুলে গেছ। শ্বাশুড়ীদের গরদ তসর ননদের ননদপুটুলি, ছোটদের জামাকাপড় খেলনা, হাঁড়িহাঁড়ি মিষ্টি, গা-ভরা গয়না, ঘরভরা আসবাব না নিয়ে ঢুকলে তাবড় চাকুরে বৌয়ের দর নেই।"

"তোমার দাদারা দেবেন নিশ্চয়, বিয়ে একটা ঠিক হলে।"

"ওরা তিনজনে যা চশমখোর! কোনও আশা নেই ওদিকে। তবে আমিই টাকা জমিয়েছি। অন্য চাকুরে মেয়েবাও তাই করে।"

কিন্তু বিবাহের পক্ষে যা বাধা, সেগুলির পাত্রীর দিকের গবেষণা আমি জানতে পাই ব্যানার্জি মারফৎ। পুত্রের জননী নাকি প্রায়শঃ দারুণ possessive, কিনা কর্তৃত্বপ্রিয় হন। ছেলেকে সহজে অনেকেই অন্যের হাতে তুলে দিতে চান না। অবশ্য বহু শোভন ব্যতিক্রম আছে। কি যে চান তিনি বলা শক্ত। অনেকক্ষেত্রে ছেলে হয় ক্ষেপে উঠে নিজে বিয়ে করে ফেলে নয়তো অনূঢ় থাকে।

জননীর পরে—যদি পাত্র ধনী হয়, থাকে নির্ভরশীল আত্মীয়-

স্বজন, থাকে কুমারী ভগ্নী। পাহারা দেয় তারা পাত্রকে। কন্যাপক্ষের সকলে মিলে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে গেঁথে তুলতে হয়। প্রেমমূলক বিবাহেও একই কথা এখন। "দুজনে দেখা হল, মধুযামিনীরে"—গানটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

ব্যানার্জি উপার্জনক্ষম। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে বহু বেকার তাকে চায়। স্বল্পবিত্ত পরিবারে তার আদর। একটা রোজগারের যন্ত্র সংসারে যুক্ত হলে আয়পথ বৃদ্ধি।

কিন্তু ব্যানার্জির পছন্দ খানদানী হওয়ায় বিপদ ঘটেছে। কলিকাতার বাইরে দিদির বাড়ী যেয়ে এক পদস্থ বয়স্ক চাকুরিয়ার সাক্ষাৎ পেল। সবদিকেই যোগ্য। ব্যানার্জি উঠে পড়ে লাগল। ভদ্রলোকের মাতাপিতা নেই। ব্যানার্জি ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু এ যে আরো সঙ্কট অবস্থা। মাতাপিতা তবু ছেলের স্বার্থ দেখে থাকেন নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যে গার্জা-গার্জা অভিভাবক। বয়সে ভদ্রলোক সকলের বড়। অসংখ্য ভ্রাতাভগিনীর চাহিদা মিটিয়ে বিয়ে করা ঘটে ওঠেনি এখনও। বিবাহে ইচ্ছা আছে।

প্রথমে দেখা গেল, বাড়ীতে একজন ছোট ভাই, তার স্ত্রী পুত্র কন্যা ছুটিতে এসেছে। সঙ্গে ভায়ের শাশুড়ী ও চারজন শ্বশুর বাড়ীর লোক। তারা শরীর সারাতে এসেছে। ছোটভাইয়ের নিজের কর্মস্থল স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত হলেও সেখানে যে গৌরীসেনের ধর্মশালা খোলা নেই।

খাওয়া দাওয়া, বেড়ানো গাড়ী করে, সে এক এলাহী কাণ্ড। বাড়ীর কর্তা চোর হয়ে একপাশে বসে আছেন। লোকটির সকাতর দৃষ্টি ব্যানার্জির করুণা উদ্রেক করে ফেলল। তাঁকে উদ্ধার করা কর্তব্য বলে ব্যানার্জি মনে করল।

কিন্তু ওরে বাবা, ওরে বাবা! চোরকাঁটার বেড়া, কাঁচভাঙা-মণ্ডিত প্রাচীর, কাঁটাতার সমস্ত কিছু এই নিরন্তর মনুষ্য প্রাচীরের অবরোধের কাছে হাস্যকর।

ব্যানার্জি বেড়াতে যেয়ে উৎসুক ভদ্রলোকের সঙ্গে বসার ঘরে ছোট ভাইয়ের পাহারায় গল্প করছে। ছোট ভাইয়ের কাছে দর্শনার্থী এলেন। ছোট ভাই চট্ করে পত্নীকে রান্নাঘরের তদারকী

থেকে এনে বসিয়ে রেখে তবে গেল।

ব্যানার্জির দিদির গাড়ী আছে। রাত্রে ঘোরাঘুরির পরে দিদি ও ব্যানার্জি গেলেন। দিদি চলে এলেন, গাড়ী পরে পাঠাবেন বলে। ছোট ভাই ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়। চট্ করে কড়া কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে পাহারায় বসল।

ভদ্রলোক লাজুক, স্ত্রীসঙ্গে অনভ্যস্ত। ছোট ছোট নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা সম্যক পরিচালিত ও হতবাক্।

সেবার চলে এল ব্যানার্জি। পরের বার যেয়ে দেখল এবার বিধবা দিদি বিবাহিতা কন্যাদের কয়েকটি পুত্রকন্যা সহ অন্তেবাসী। এদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ কামাই গ্রাহ্য করে না। দিদির নিজের ছেলেরা অবশ্য ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর শহরের বাসিন্দা।

এবারও সুযোগ মিলল না। ব্যানার্জির তখন জিদ চেপে গেছে, ভদ্রলোকের করুণ অবস্থায় দয়াও হয়েছে। সুতরাং ব্যানার্জি ছুটে গেল পুনরায়।

এবার অবস্থাটা আরও সঙ্গীন। ব্যানার্জিকে পাহারা দেবার বহু লোক।

ভদ্রলোকের একটা অসুখ করেছিল। সুস্থ হবার পরেও কম্‌লি ছাড়ল না। ওঁকে দেখাশোনার লোক নেই অজুহাতে পালা করে আত্মীয়েরা পাহারা দিচ্ছে। এক ভাইবৌ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, কারণ সে প্রখর বুদ্ধিশালিনী। বাইরে অকথ্য আবদেরে কচিখুকুর ভাব। ভদ্রলোককে রোগী বানিয়ে রাখা হয়েছে! ভাইবৌয়ের ট্যাক্‌টিস অপরাজেয়। ভদ্রলোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "উনি আবার এ বয়সে বিয়ে করবেন কি?"

মুখে আবার ওঁর সম্মুখে ব্যানার্জিকে সমাদর দেখায়। আড়ালে জানিয়ে দিতে ভোলে না। ভাসুর চিরকুমার থাকার ব্রতে দীক্ষিত।

হাল ছেড়ে ব্যানার্জি চলে এল।

কিছুদিন পরে শুনল, ভদ্রলোক এক দিদির বয়সী স্কুল-পরিদর্শিকাকে বিবাহ করে ফেলেছেন।

এক চক্ষু হরিণেরা ব্যানার্জিকে প্রহরা দেওয়ার সময়ে বয়সে বড় ভদ্রমহিলাটির দিকে নজর রাখা দরকার মনে করে নি কিনা।

আমার কিছু নিজস্ব গবেষণা থাকলেও মূলতঃ বন্ধু ব্যানার্জির অভিজ্ঞতার অবদানই বর্তমান রচনার উপজীব্য। তাই শিবোনামা ব্যানার্জির নামে রেখেই ওকে সম্মান দিলাম।

কিন্তু সম্প্রতি নিজেও একটা বস্তু লক্ষ্য করছি, সেটা না জানালে স্বস্তি নেই।

পূর্বে সমাগত লোকেরা গেটের সপ্তদশীকে বিবাহের কথা বলতেন। শার্লত্ ব্রতের অধ্যাপক বৃদ্ধ হেজারের প্রতি প্রেমের নজির দেখাতেন।

এখানকার এঁরা বলেন শেকসপীয়রের বয়োজ্যেষ্ঠা পত্নীর কথা। উদাহরণ তোলেন এলিজাবেথ বাউনিংএর তরুণতর রবার্ট ব্রাউনিংকে প্রেমদানের প্রসঙ্গ।

আমার বন্ধু ব্যানার্জিও আছে, আমিও আছি। শুধু আমাদের জগতে এইটুকু বদলে গেছে।

বসে ভাবছি পৃথিবীর রূপ পাল্টে যাচ্ছে, তবুও কতকগুলো বস্তু মনকে টানে ঠিকই। বাংলাদেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে, কিন্তু আমাদের ব্যানার্জী এখনও, 'সেই চাঁপা, সেই বেলফুলের ডালার স্মৃতি এনে দেয়।

প্রেমের এখনও সার্বজনীন শক্তি আন্দোলিত বার বার। 'লাভ' ও 'ওয়ার সমসূত্রে বাঁধা বোধ হয়, যেমন বলা হয়।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময়ে রীণা বোস এসে হাজির। প্রকাণ্ড পাখীর ঝোপড়ি মাথায়, কিন্তু হায় সখি হলা পিয় সহী, শাদা তার দেখা যায় যে!

রাণীকে বললাম, 'চুল কতদিন রিনজ করোনি?"

"আরে ভাই, বয়স হয়ে গেল, দিন বয়ে যাচ্ছে। তোমার মত বন্ধুরা তো ফিরেও চাইবে না।"

আমি বললাম, 'আমার বন্ধুরা ফিরে চাইলে যে তোমার পক্কতা নিবারিত হত, একথা জানা ছিল না।'

'আমি সেই অর্থে বলছি নাকি? কলম হাতে বন্ধু একটা শক্তি ব্যানার্জীর কথা লিখে তার বেদনা প্রচার করল, অথচ

আমার বিষয়ে ভাবো না। ব্যানার্জীর পাত্র সংগ্রহ পাত্রের আত্মীয়-স্বজন ব্যাহত করেছে কিভাবে, ফলাও করে কাগজে লিখে জানালে। কবে ব্যানার্জী শিলং-এ যেয়ে পদস্থ চাকুরিয়ার ব্যাপারে কি করেছিল লিখলে। ব্যানার্জীকে পাত্রের আত্মীয়েরা বাধা দিয়েছেন। কেন বা দেবেন না? ব্যানার্জি যে অন্য দিকেও চালাচ্ছিল অন্য আর এক বয়স্ক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু আমার অবস্থাটা? ব্যানার্জী ব্যক্তিটিকে লাজুক বলেছিল, আমার সেই ব্যক্তিটিকে দেখলে কি বলতে শুনি? 'হিস্টরি রিপিটস ইট-সেলফ'। ব্যানার্জীর কেসের সঙ্গে আমারটার দারুণ মিল আছে। কি করে এমনটা হোল ভেবেও পাইনে।"

আমি বললাম, 'ভগবানের ছাঁচ তো বেশী নেই কিনা। তাছাড়া উক্ত সত্তা বেজায় হিসাবী। একখানা ছাঁচ তুলে সেটি ফেলে দেওয়ার অভ্যাস নেই। সযত্নে রেখে দিয়ে পুনরায় কাজে লাগান। ভাগ্যক্রমে ব্যানার্জী আর তোমার ছাঁচটা একই হয়েছে।'

রীণা বলল, 'আশ্চর্য! ইনিও বয়স্ক পদস্থ চাকুরিয়া। ইনিও অনেক ভাই বোনের বড়দাদা। উপরন্তু ইনি স্কলার এবং নাম্যমাণ চাকুরিয়া। সারা দেশব্যেপে পূর্বরাগের পালা চলে। কিন্তু প্রধান তফাৎ যে এরা অনাগ্রহী নয়, অতি আগ্রহী।'

'তবে বাধা কোথায়?' আমি প্রশ্ন পাঠালাম। রীণা তখন একখানি কাহিনী জানাল।

রীণা আমার বন্ধু ব্যানার্জীর মত বড় চাকুরিয়া পাত্রী না হলেও অধিকতর লোভনীয়া। গায়িকা সে নামকরা। রেকর্ডও আছে। কোনও এক গানের নিমন্ত্রণে রীণা গিয়েছিল কলকাতার বাইরে এক বর্ধিষ্ণু শিল্পনগরে। ভদ্রলোক কর্তাব্যক্তি, স্থান না পাওয়ায় ওঁরি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা।

ভদ্রলোক রীণার গানের ভক্ত। বাড়ীতেও রেকর্ড আছে। নইলে হয়তো অমন অসাধারণ লাজুক ব্যক্তির অনাত্মীয়ার সঙ্গে

মেশার কোনও প্রবৃত্তি হোত না। দেবতুল্য, সাধুতুল্য দ্বিতীয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মহাশয়। অসহ্য চরিত্রবান পুরুষ, এক ভয়াবহ বস্তু। তায়, রীণার মতে 'Introvert' অর্থাৎ অন্তঃশীলা মনবিশিষ্ট।

এখানেও ছোট ভাই উপস্থিত। তিনিও ঘুম তাড়িয়ে এসে বসলেন প্রথম রাত্রে।

পাহারা দিতে নয়, লজ্জিত দাদাকে সহায়তার জন্য। দাদা নির্বাক, ছোট ভাই নানারূপ ইঙ্গিত দিচ্ছেন। দাদার অগোচরে প্রকাশ্য পরিহাস করছেন।

রীণা চিন্তিত! ভদ্রলোক নাবালক অথবা মূক বধির নন, অথচ কথা চালায় ছোট ভাই কেনরে?

তবে কি দাদা সংসারছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে চিরদিন থাকবেন, ভেবে রীণা বোসকে জোর করে দাদার অনিচ্ছায় কাঁধে চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে?

না কি পরিহাস, মজা দেখা?

কিন্তু ভাইও বয়স্ক, উচ্চশিক্ষিত। দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত। ছেলে-মেয়ের বাবা, বিবাহিত। উপরন্তু ঘোর সংসারী। দাদার ছন্নছাড়া সংসারটি বাধ্য হয়ে গুছিয়ে দিতে হয় মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক বা একলা এসে।

রীণা ধরে নিল যে ভাই তিতেবিরক্ত হয়ে দাদাকে একজন অভিভাবিকার হাতে তুলে দিয়ে চুটিয়ে ব্যবসায়ে নামতে চাইছে। দাদা বিবাহে সত্যই অনিচ্ছুক নিশ্চয়।

অতএব রীণা বোসের আত্মসম্মানে বাধল। সে-ও বহুজন-বন্দিতা, গুণবতী। তাকে কোন পুরুষের ঘাড়ে গছানোর প্রশ্ন ওঠে না। এ কী কথা রে বাবা?

অতএব ভদ্রলোককে ভাল লাগলেও রীণা বোস নির্লিপ্ত ঔদাস্যের অভিনয় করে চলে এল সে দেশ থেকে।

বেচারী ছোট ভাইয়ের প্রাণের ওপর দিয়ে উঠল। সে রীণার

শহরে এল। পরিচয় ও বন্ধুত্বের খাতিরে দেখাশোনা করতে এল। তখন আবার পরোক্ষভাবে ঘটকালি।

কিন্তু দাদার তরফ থেকে কোন কথা নয়, সে নিজেই ঘটক। বুঝে দেখ অবস্থাটা। যেখানে বয়স্ক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্রপাত্রী পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচিত, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলে কেন? তাছাড়া পাত্রের মনোভাব সম্পর্কে একটি কথাও নয়। যেন সে নিজে রীণার কুমারী দশা দেখে দয়াপরবশ। সেই করেকর্মে দিচ্ছে অগত্যা।

রীণার আত্মসম্মানে ফের ঘা লাগল। সে সুদূর আভিজাত্যে নাগরিকসুলভ হাল্কা ভাবই দেখাল।

এখানে আমি বাধা দিলাম, 'কিন্তু তুমি ছোটভাইয়ের মনের কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছ না কেন? সে দাদাকে অতি দুর্লভ সামগ্রী মনে করে। আর, সত্যই দুর্লভ ব্যক্তি নিশ্চয়, নইলে তুমি মনে মনে রাজী হবেই বা কেন? ছোট ভাই ভেবে নিল তুমি যখন প্রকৃত মনোভাবের ধরাছোঁয়া দিচ্ছ না, তখন সেই বা দাদার কথা বলবে কেন? যদি তুমি রাজী না হও?'

"রাখো। গা জ্বলে যায়!"

যাই হোক, ভদ্রলোক অন্য প্রদেশে বদলি হলেন। কপাল-গুণে রীণারও সে শহরে সঙ্গীতের আমন্ত্রণ মিলে গেল। ঠিক ব্যানার্জীর পরিস্থিতি, কিন্তু প্রভেদ যে এই ক্ষেত্রে বিধবা দিদি ও পুত্রকন্যা নীরব ও চিরমূক ভদ্রলোকের প্রেম বিষয়ে অগ্রণী হলেন।

মহা বিপদে পড়েছেন ওঁরা। তরুণী কন্যাদের অন্যত্র আকর্ষণ, এখানে তবু থাকতে হচ্ছে। ছেলের আধ-পাড়াগাঁ জায়গা ভাল লাগে না। দিদিও সংসার ফেলে ভাইকে দেখাশোনা করতে এসে সংসারের বিশৃঙ্খলা দেখে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

আহারাদির পরে দিদি ডাকলেন, "এসো রীণা, গল্প করি।"

যার ডাকার কথা সে ডাকে না কেন? রীণা ক্ষুব্ধ। ভাইয়ের

সংসারে হাউস্‌কীপার চাই, তাই অনিচ্ছুক পুরুষের ঘাড়ে ওকে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে! ভদ্রলোকের ইচ্ছা থাকলে উনি নিজেই ডাকতেন।

সুতরাং মানিনী রীণা "ঘুম পেয়েছে" বলে নিজের ঘরে গেল। পরের দিন বিদায়।

তৃতীয়বারে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে সর্বকনিষ্ঠ ভাই ও। ভ্রাতৃবধূ উচ্চশিক্ষিতা, ভারী মিষ্টি মেয়ে। সহজ ও আন্তরিক ব্যবহারে রীণাকে জয় করে নিল।

রীণাদের শহরে যাতায়াতের পরিধির মধ্যে তার ও ভাইয়ের ব্যগ্রতা প্রকাশ পেল। তারা দাদার কাছে উপকৃত। দাদার সম্প্রতি একটা অমূল-তরুর মত রোগের ভয় হয়েছে। তারা ভয়ে ও ভক্তিভরে সায় দিচ্ছে নিরন্তর। স্ত্রীবর্জিত সংসারে এসে দেখাশোনা করে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করছে। সরল পুরুষের এই সামান্য দুর্বলতাটুকু সহ্য করছে। দাদার সম্মুখে রীণাকে ছোট ভাইবৌ অনুরোধ করে, "ওর পাশে বসুন।"

দাদা নির্বিকার, মুখ ভাবলেশহীন। রীণা বুঝতে পারে না। অথচ প্রকাশ্য এ ধরনের ইঙ্গিতে লজ্জিত হয়ে ওঠে। লজ্জাকে সে আবৃত করতে চায় নিস্পৃহতা দিয়ে।

এখানে আমি বললাম, "এটা বুঝছ না কেন যে অতবড় গুরু-গম্ভীর পুরুষের সম্মুখে ইঙ্গিত দেওয়া বা পরিহাস করার অর্থ তিনি স্বয়ং বিমুখী নন।"

'রাখো তোমার যুক্তি। দেহাতীপনা যত! আমাদের দেশে এ রকম চলন নেই। বয়সে ছোটরা এতটা এগিয়ে আসে না।' রীণা চটে ওঠে।

'আহা যদি আসল ব্যক্তি মৌন থাকেন তবে অন্যরা হাত লাগাবে না? তারা তো ব্যানার্জীর অভিজ্ঞতার লোক নয়। তারা ভাঙতে চায় না ঘটাতেই চায়।'

'কিন্তু ফল যে একই দাঁড়ায়। এসব বস্তু কি তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে হয় না কি?'

আমি ভেবে-চিন্তে বললাম, 'তোমার বর্ণনা শুনে মনে হয় যে সর্বদা জনসমাগম ছিল। কখনও কি ব্যক্তিটিকে একলা পাওনি?'

'তা, সামান্য কিছুক্ষণ পেয়েছিলাম মাঝে মাঝে বইকি।'

'তখন কোন ভাব দেখলে ও'র?'

রীণা উত্তর দিল, 'হতাশ।'

'তবেই বোঝ, লোক জড়ো না হয়ে করে কি? তৃতীয় ব্যক্তির কথা না বলেই বা চলে কি?'

'বাজে কথা রাখো! আসল লোক মুখ খুলছে না অথচ আমাকে জোর করে ঘাড়ে গছানোর চেষ্টা। যে দেশে দু'জন বয়স্ক, শিক্ষিত ব্যক্তির বিয়ে ঠিক করতে তৃতীয় ব্যক্তি লাগে, সেদেশের ভরসা নেই।'

আমি ধীরভাবে উপদেশ দিলাম, তোমার কথা আমি লিখব। কিন্তু তোমাকে একটা উপদেশ দিই। মেঘে মেঘে বেলা হচ্ছে। অন্য কিছু না পার, একটি কথা সোজা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কোর তাতেই কাজ হবে।'

'কী?'

'ভদ্রলোককে নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করবে যে, বিবাহ যদি হয়, তারপরে ওঁর পরিবারের সমস্ত লোকেরা কি এক গৃহেই সঙ্গে শয়ন করবে? তখনও প্রয়োজন হবে?'

রীণা মনে মনে কথাটা আউড়ে নিল, 'এটা আর এমন কি কথা? বেশ বলতে পারব।'

রীণা চলে গেল, আমিও মনে মনে হেসে লেখায় মন দিলাম।

কিছুদিন পরে টেলিফোনে রীণার আমাকে তর্জন-গর্জন। কথার কাজ হয়েছে বটে, ভদ্রলোক মুখ খুলেছেন। যাচ্ছেতাই গালাগালি করে রীণার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করেছেন।

শক্‌থেরাপীর কাজ হয়েছে, কিন্তু উল্টো বাগে।

বাই দি ওয়ে, আমার বন্ধু ব্যানার্জীর বিবাহ হয়েছে। আমার বর্ণনা এই 'যুগান্তরে' পড়ে এক সহৃদয় বিপত্নীক সমবেদনায় কাতর হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রস্তাব দেন। ব্যানার্জীর চাহিদার সব কয়েকটি এখানে মিলেছে। শুধু ভদ্রলোক বিপত্নীক, একটি পুত্র আছে।

ব্যানার্জীর মতে পুত্র থাকা ভাল। মেয়ে থাকলে বিয়ে দেওয়া আছে, তত্ত্বতাবাস আছে। নিজে বিবাহ ব্যাপারে হয়রাণ হয়ে সে চিন্তা ব্যানার্জীর কাছে ভয়াবহ। বরঞ্চ ছেলে বড় হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে একটা রাজনৈতিক দলে ঢুকে যাবে এবং দেশোদ্ধারের মহান ব্রতে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে।

ফলে গৃহে ব্যানার্জীর নিরঙ্কুশ শান্তি।

—:::**:::—

বিনে ভোজে নিমন্ত্রণ

বিনে নেমতন্নে ভোজ বলে বাংলাভাষায় একটা চলতি কথা পাই। এ বিষয়ে ভাবলে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ট্রিলজিখ্যাত উপন্যাস উপকণ্ঠের নায়ক হেমের বিনা নিমন্ত্রণে বিয়ে বাড়ী ঢুকে ভোজ খেয়ে নেওয়ার চিত্র মনে পড়ে। অনুরূপ আরও ঘটনা জানা আছে।

কিন্তু নিমন্ত্রণ করলাম অথচ ভোজ নেই, সেটা কি রে বাপু?

অনেক অর্থে বলা চলে।

অনেক ক্ষেত্রে হাত টেনে পরিবেশন দেখেছি। বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে আহার আয়োজনের স্বল্পতা হেতু অতিথি না খেয়ে গেলে বিশেষ অসন্তুষ্ট হন না অনেকে। লুচি একবার দুখানি দিয়ে অদৃশ্য। মিষ্টান্ন এলই না এক নিমন্ত্রণ বাড়ী, এ সমস্ত দেখা আছে।

কিন্তু কোনটাই সার্বজনীন সত্য নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র প্রযোজ্য। মেয়ের বিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে শতশত লোককে পাতা পেড়ে খাইয়ে কতুর অথচ চরম পরিতৃপ্ত, দেখেছি বই কি।

ওসকল কথা আজ আলোচ্য নয়।

আমি একখানি গল্প বলে দিতে চাই।

এক ভদ্রমহিলার কাছে শোনা। আমার প্রায় সকল গল্পই ভদ্রমহিলাদের কাছে শোনা। কি আর বলি? ভদ্রমহোদয়গণ তো আমার কাছে প্রাণের কথা খুলে বলবেন না সর্বদা চেকে চেপে রংপালিশে কথা সাজাবেন ওরা।

কাউকে লক্ষ্য করে বলছি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার এক সুপ্রাচীন শ্লোক :—

"শাল-দোশালা যে যা-ই পরে,
ছাপা নেই তা ধোপার ঘরে।"

কাউকে লক্ষ্য করে কিছু বলছি না, কিন্তু মহিলারা যেমন সাদাসিদেভাবে নিজের জাতির অকপট নিন্দা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে করে যান, পুরুষ তেমন করেন না নারীর কাছে নিজ জাতির নিন্দাচর্চা। চেপে যান বেমালুম। এতে প্রমাণ হয় না যে ওঁরা মহৎ। ওঁরা জাত্যাভিমানী। স্বজাতির নিন্দা করবেন কেন? তবে হ্যাঁ, অন্য জাতির করে থাকেন বই কি। অনেক মহিলা-জাতির সোৎসাহ এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক পুরুষজাতির মুখে শুনেছি।

ধান ভান্‌তে শিবের গীত আর গাইব না। আমার বৌদির দিদির মুখে এক মহতী গল্প শ্রবণ করেছিলাম।

মহিলার ছোট বোন মফঃস্বল স্কুলে শিক্ষাবৃত্তি নিয়েছেন। দেহাতী শহরটিতে খাদ্যদ্রব্য বড় আক্রা, উৎপন্ন বিশেষ কিছু হয় না।

স্কুলের নিকটে সারি সারি শিক্ষিকাদের কোয়ার্টার। সেখানে মঞ্জুশ্রী ও সহপাঠিনী বন্ধু বিনতা থাকে। বিনতাও শিক্ষিকা। মিলে মিশে দুজনে আছে বেশ।

অদূরে কলেজ সহশিক্ষার। সেখানের অধ্যাপকদের অনেকে এঁদের দুজনের পরিচিত ও বন্ধু।

মঞ্জুশ্রীর কোয়ার্টারে দিদি কয়েকদিনের আমন্ত্রণে গেছেন। বিনতার সঙ্গে আগেই চেনা ছিল। এখন অষ্টপ্রহর 'দিদি, দিদি' ডেকে মাখামাখি করতে লাগল।

মঞ্জুশ্রী গৃহস্থ মেয়ে, দিদির মত গোছানী ও সুগৃহিণী। বিনতার সাজ-পোষাক, হৈ-হুল্লোরে মন।

একদিন বিনতা গোটাদশ বেলায় মঞ্জুশ্রীর বাড়ী এসে বলল, "দিদি, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব। সন্ধ্যাবেলায় মঞ্জু আপনাকে নিয়ে আমার ওখানে খাবে। আরও দুতিনজন ভদ্র লোককে বলেছি।"

ওখানে চাকর-ঝি পাওয়া যায় না। পেলেও মফঃস্বলী স্কুলের যৎসামান্য বেতনে রাখা চলে না। ঘরে ঘরে শিক্ষিকারা যে-যার রান্না করে থাকেন নিজের হাতে।

দিদি পাকা রাঁধুনী। সামান্য কিছু একবেলার মত রান্না করে রাখলেন। ভোজ খাবার আশায় তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে দিলেন।

একটু পরেই এসে গেল বিনতা ছুটে, "দিদি, আপনার ভাঁড়ারে মুগের ডাল আছে? খিচুড়ি করব। বর্ষার দিনে চমৎকার লাগবে।"

দিদি পাঁচছজন লোকের ডাল বার করে দিলেন। আবার এল বিনতা, "মঞ্জু কোথায়? দিদি, দুটো কাঁচালঙ্কা আর একটু আদা দিন না। কিনে রাখিনি।"

দিদি নিরুত্তরে দিলেন।

মঞ্জু গজ্‌গজ্‌ করছে, "এখানে আদার যা দাম! আমার সর্দিকাশি। নিয়ে গেল সবটা।"

আবার বিনতা এল ঘি চাইতে।

মঞ্জু ততক্ষণে চটে লাল, "কাছেই দোকান। কিনে নিয়ে আসবে না, কেবল রান্না চড়িয়ে চেয়ে নিয়ে যাবে।"

বিকেলে চা-খাবার সময়ে এল বিনতা অবার, "দিদি, আপনাদের বেগুন আছে? বেগুন ভাজা খাওয়াবো আজ। আমি বড় বেগুন ভালবাসি।"

মঞ্জু রাগ করে উঠে গেল। বিনতা অবশ্য বুঝতে পারল না, কিম্বা বুঝতে চাইল না।

দিদি হাসতে হাসতে বেগুন দিয়ে বল্লেন, "সারাদিন ধরে রাঁধছ না কি?"

"না, না, যোগাড় করে রাখছি। সন্ধ্যায় চাপিয়ে দেব।"

সন্ধ্যার আগে বিনতা একবার গরমমশলা নিয়ে গেল। আর একবার এল আলু চাইতে, "পটল কিনেছি।—হ্যাঁরে মঞ্জু তোদের আলু আছে?"

আলুর ঝুড়ি উজার করে আলু নিয়ে ওঁদের তাড়াতাড়ি ভোজ খেতে যাবার অনুরোধ জানিয়ে বিনতা অদৃশ্য।

মঞ্জু বলল, "আমার ভাঁড়ারটি উজাড় করে নিয়ে গেল। কাল বাজার করে তবেই হাঁড়ি চড়বে। এতদিনের মধ্যে কখনও নেমতন্ন করেনি, আজ ঘটা করে কেন যে বলল, বুঝলাম না। রুটী কেটে খায় ও সহজে রান্না করে না। বোধহয় ইতিহাসের প্রোফেসর কিশোর দত্তকে খাওয়াবে বলে আয়োজন করছে। উনি ভাল রান্না খেতে ভালবাসেন।"

"ও ভালো রাঁধে বুঝি?"

"কী জানি, কোনদিন খাইনি।"

সন্ধ্যার পরে দিদি ও বোন বিনতার কোয়ার্টারে রওনা হলেন। পথে মঞ্জু বলল, "এ আবার কেমন ধারা ভোজ? আমাদের জিনিষ নিয়ে আমাদের খাওয়াবে না কি?"

দিদি বল্লেন, "নারে, তা কি হয়? মাছ-মাংস আছে, দই-মিষ্টি। সবই ওকে আনাতে হয়েছে।"

মঞ্জু বলল, "কে জানে? ধরণটা ভালো লাগছে না আমার।"

পৌঁছে দেখা গেল বাইরে বসবার ঘরে তিন সুসজ্জিত তরুণ, মধ্যে সুসজ্জিতা বিনতা। হাসিগল্পে মত্ত। "এই যে দিদি, আসুন, আয় মঞ্জু। দিদি এখানে এখন এসেছেন, তাই দিদিকে

খাওয়াবার জন্যেই নেমতন্ন।"

বসবার ঘরে আপ্যায়িত করে দিদিকে, মঞ্জুকে বসাল বিনতা। পাশের প্যাসেজ দিয়ে গেলে রান্নাঘর মেলে, একাংশ দেখা যায়। সে স্থান জনশূন্য।

একটু কথার পরে বিনতা দিদিকে ডেকে বাইরে আনল, ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "খিচুড়ি হয়েই গেছে। আলু, পেঁয়াজ ছেড়েছি। শুধু ঘি গরমমশলা দিয়ে নামাবার অপেক্ষা। দিদি, আপনি পাকা রাঁধুনী মানুষ। আপনি রান্নাঘরে একটু ঠিকঠাক করে দিন না। আমি আবার এঁদের একা রেখে বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না রান্নাঘরে। ভাল দেখায় না।"

রান্নাঘরে খিচুড়ি চড়েছে ঠিক। পাশে কালি করে থালায় বেগুনভাজা কোটা আছে। আলু পটল বঁটীর ধারে গড়াগড়ি যাচ্ছে। শালপাতায় একগাদা কুচো চিংড়ি।

"কি কি রান্না করবে?" দিদি ইতস্ততঃ তাকালেন।

"বেশী কিছু না। খিচুড়ির সঙ্গে বেশী লাগে না। বেগুন-ভাজা, আলু-পটলে চিংড়ি মাছের ডালনা। মাছও হবে, তরকারীও হবে। আপনি ততক্ষণ একটু বুঝে নিয়ে সামলে দিন, দিদি।"

দিদি বুঝে নিয়ে কাজে লাগলেন।

"আমি কুচো চিংড়ি মাছ খাই না। ডালনা তুলে রেখে মাছ দিলেই হবে।"

"সে আপনি যা ভালো বোঝেন, দিদি। আমি যাই ওদিকে। বেজায় অভদ্রতা হচ্ছে।"

দিদি কোমরে কাপড় জড়িয়ে মাছের তরকারী কুটে, মাছ কুটে নিয়ে মাছের ডালনা চাপালেন। খিচুড়ি নামালেন, ভাজা ভাজলেন।

মঞ্জু হতবাক হয়ে রইল।

সেদিন তিন পুরুষবন্ধু বিনতার রন্ধন-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা

করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আইটেম্ কম হলেও নিখুঁত নেমতন্ন।

শিরোনামার কথাটা খণ্ডিত করতে হচ্ছে কিছু। ভোজ যেমনই হোক, একটা ছিল বটে।

-:::*:::-

"খাই খাই কর কেন ?
এসো, বসো আহারে"

মানুষ বাঁচে খেয়ে, আবার মানুষ খাবার জন্যেও বাঁচে। আবার আমার পিতৃদেব বলতেনঃ মানুষ খেয়ে যত মরে, না খেয়ে তার চেয়ে কম মরে। উদাহরণতঃ নিজের খাদ্যগ্রহণ কমিয়ে প্রায় নাস্তি পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। ফলে ভালো হয়েছিল একথা বলা চলে না।

আমার বাড়ীর লোকেরা অল্প বিস্তর খাদ্যরসিক অর্থাৎ আহার হলেই হবেনা, আহার স্বাদু হওয়া চাই। অন্যথায় না খেয়ে থাকবেন।

আমার এক ভাইপোর সাহচর্য দীর্ঘদিন পেয়েছিলাম আমাদের প্রবাসের বাগানবাড়ীতে। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি সেই দশবারো বৎসরের বালক সর্বদা আমার ইংরেজি পত্রিকাগুলো হাতায়। দেখলাম ছবি দেখে মনোযোগ সহকারে—সমস্ত ছবি আহার্যের হায়, আমার সেই হাল্কা তরুণ দিনে গাদা-গাদা 'লেডিস্ ওন্', 'ওম্যানস জর্নাল' ইত্যাদি পড়ে কাটাতাম। সেগুলোই নিয়ে গেছি। বালক দেখছে ডিনার সাজানো টেবিলের ছবি, লাঞ্চ রান্নার সজ্জিত কৌশল, কেকের লোভনীয় রূপ রেসিপে সহ, দুধের, কোকোর, মল্টেড্ মিল্কের সারিবদ্ধ গ্লাস ইত্যাদি।

কৌতুহলী হলাম। ওর চরিত্রের রূপটি ধরবার চেষ্টা পেলাম সযত্নে।

যত খাওয়া হয়েছে অতীতে, যত খাওয়া হচ্ছে এখন, যত খাহয়া হবে ভবিষ্যতে—সেই আলোচনা নিয়ে কথাবার্তায় স্পৃহা ওর। প্রসঙ্গ এক।

বাড়ীর লোক হাতে পেয়ে বেচারীর যশ আমি নাশ করার প্রয়াস পাচ্ছিনা। হাতের কাছে স্পেসিমেন্ পেয়ে একটা সার্বজনীন সত্যের উদারহণ দিচ্ছি মাত্র।

আহার্য বস্তু নিয়ে আলোচনা অনেকেই ভালবাসেন। কোথাও কেউ আকণ্ঠ খেয়ে এলে সেই মেনুর কাল্পনিক রস চেখে দেখেন অন্য দশজন।

"খুব খাইয়েছে।"

পরিতৃপ্ত ভোক্তাকে ঘিয়ে অন্য দশজন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, "কি কি খাওয়ালে?"

সবিস্তার বর্ণনায় ভোক্তার পুনরায় রসাস্বাদন করা হয়।

মহিলারা খাদ্যে যোগান রসের অনুপান। শ্রীহস্ত প্রস্তুত করা বলে নয়, নির্দেশনামা দেন বলে নয়। খাদ্যজাতী বস্তুর উপর মনোযোগ অতি বেশী। কি দিয়ে কি রান্নায় সুতার হয়, কোন হাঁড়িতে কি রান্না উঠেছে। বড়ি, আচার জেলি নির্মাণে, জল-খাবার করাতে রস পান তাঁরা প্রচুর। যে মেয়ের টুকটাক রান্নার (হাঁড়িঠেলার নয়) সখ নেই, সে মেয়ে জন্ম নিয়েছে না কি?

এক-একজন আবার যা-যা প্রস্তুত করেছেন, মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন ব্যাখ্যা সহ। আমার এক বৌদির কথা মনে পড়ছে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রখানি মানসে উদিত হয়ে আবার তাঁকে রসে পরিপ্লাবিত করত। যথা:—

—"পোনেরো সের দুধ রেখে বাড়ীতে ছানা কাটিয়েছি। এমনি বড় বড় শাদা সন্দেশ করলাম গোটা গোটা। দু'খানা শ্বেত পাথরের থালায় সাজিয়ে রেখে এলাম। ক্ষীর করলাম এতখানি। ক্ষীরে পুর দিয়ে মালপো ভাজলাম—ছুটি গামলা ভরে। বগি থালায় ছড়িয়ে রেখে এলাম এমনি করে লবঙ্গলতিকা—" ইত্যাদি ইত্যাদি হস্তমুদ্রার সাহায্যে উজ্জল করে তোলা।

থাক্, বেশী বলব না, পাঠক হয়তো এতক্ষণে লোভাতুর। আর একদল মহিলা রান্নার উল্লেখ করার কালে রেসিপেটা বলে দেন। কোন্ কোন্ মশলা দেওয়া হল, কেমন করে রান্না হল। আমি এঁদের সঙ্গ সছন্দ করি, কারণ আমার অবচেতন মনের সাধ আমি রাঁধুনীখ্যাত পাই। একগাদা পাকপ্রণালী নানা কাগজ সেকে কেটে কুটে রাখতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই রান্না করা ঘটে উঠত না।

মহিলাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রেসিপে কণ্ঠস্থ করে আসতাম। পথে আসতে আসতেই ভুল। অতএব আমার গৃহানিহিত সত্তায় আমি রাঁধুনী হলেও বহির্সত্তায় আমি একদম একটি গরু, অর্থাৎ কিনা যে রান্নার প্রয়োজনবোধ করেন।

বহু রান্না ও খাওয়ার গল্প আমাকে প্রায়শঃ শুনতে হয়। কেন জানিনা সকলে আমাকে দেখলে খাদ্য-বিষয়ে আমার গভীর জ্ঞান ও গবেষণা বুঝে নেন পলকপাতে। যদি বিশ্বাস না হয় চলুন আমার সঙ্গে নিউ মার্কেটে।

অন্যান্য বস্তুসামগ্রীর দোকানের শ্রেণী দিয়ে যাচ্ছি। আমিই গায়েপড়ে দেখাশোনা করছি এটা-ওটা। কিন্তু ফল বা খাদ্য সামগ্রীর নিকটস্থ হওয়া মাত্র দোকানী হৈ-হৈ করে আমাকে ডাকে।

"আসুন, আসুন মেম সাব, এদিকে এদিকে।"

যেন রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল-কলা-আঙুর-আখরোট ও বাস্ক-বাস্ক পেষ্ট্রি আমার খাদ্য!

যাকগে বাজে কথা। আমাকে বলা একটি গল্প শোনাবার জন্যই এতগুলো কথা বললাম—ব্যক্তিগত। একদিন টেবলে সকাল বেলার প্রাতরাশ খেতে বসেছি এক বিশিষ্টা বয়স্থা মহিলা বৌদিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে এলেন।

মাখনরুটী দুখানাই ডিমের সঙ্গে খাব কি না ভাবছি। অভ্যাগতা খাবার টেবিলেই বসলেন। কফির কাপে চুমুক লাগিয়ে আমাকে আপ্যায়িতের সুরে বললেন, "সকালের খাওয়াটা সেরে নিচ্ছ?" আমি অপ্রতিভ হয়ে একখণ্ড রুটী তুলে অন্য প্লেটে রাখলাম। পাশ থেকে মর্তমান কলাটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, "আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, ফিরতে দেরী হবে, তাই"—

আমি সাত-সকালে এত খাচ্ছি, নিশ্চয় মহিলা তাই ভাবছেন

"খাওয়া সর্বদা ভালো করা উচিত। তুমি কি আর খাচ্ছ? আমার ভাসুরের সকালের খাওয়া শুনবে? আশী বছর বয়স।"

"কি রকম?"

খাওয়ার সময়ে খাবার আলোচনা শুনতে আমি বেশ ভালবাসি।

"দশ বারোখানা কমপক্ষে, গরম-গরম টোস্ট উনি খেয়ে নেন মাখন আর মার্মালেড পুরু করে মাখিয়ে। দুটো করে ডিম খান। একটা আস্ত আপেল, কলা। বড় এক গ্লাস দুধ।" আমি তাজ্জব হয়ে প্রশ্ন করলাম, "সারাদিনের খাবার নিশ্চয় ?" "না, দুপুরে আবার ভাত-মাছ, তরীতরকারী, ডাল, শুক্ত, দই, চাটনি সমস্ত খেয়ে নেন।"

বিকাল ও রাত্রেরও খাবার বর্ণনা শুনে হতবাক আমি। মিন্‌-মিনে গলায় বললাম, "শরীব ভালো আছে তো ?"

"অটুট স্বাস্থ্য আমার ভাসুরের।"

আমিও কথায় কথায় আমার সরিয়ে-রাখা টোস্ট ও কলা খেয়ে নিয়েছি। এখন মনে হল : খাওয়াটা যথেষ্ট হয়নি। পেট মোটে ভরেনি।

অতএব এবং অগত্যা আমি হাতিয়ে হাতিয়ে টোস্টার থেকে বাকী টোস্টগুলো খুলে নিলাম। রেফ্রিজেরেটর খুলে জ্যাম বার করলাম মাখনের টিনের সঙ্গে। ডালমুট নিলাম, দুধে কর্ণফ্লেক ভাসালাম। দুটো ঘরে তৈরী সন্দেশ ছিল, বৃদ্ধা মায়ের উদ্দেশে, খেয়ে নিলাম।

টেবিলের ওপর প্লেটে ভাইপোদের খাবার গোটাচার ডিমের পোচ ছিল, আমার পেটে গেল।

জ্যামের নিঃশেষিত টিন ছুঁড়ে দিয়ে মাখনে হাত লাগালাম। ড্রেঁসারে সাজানো কলা-কমলালেবু নির্বিচারে ধ্বংস করলাম।

খেতে এত মত্ত হয়ে গেলাম যে কখন ভদ্রমহিলা উঠে চলে গেছেন, আমার ভাইপোরা খেতে এসে খাবার না পেয়ে রাগ করে চলে গেছে, আমার খেয়াল নেই। সকালে যেখানে যাবার কথা ছিল তাও ভুলে গেলাম।

স্নান করিনি, রাঁধুনী ভাতের থালা এনে ব্যাপার দেখে সভয়ে ফিরে গেছে। গোটা বাড়ীর কয়েকদিনের জলখাবার তখন

আমার টেবিলে কি না। মাঝে মাঝে উঠে যেয়ে নিয়ে আসছি আর মাথা নীচু করে খেয়ে চলেছি।

এইভাবে কখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এসেছে লক্ষ্য করিনি। রাত্রি হওয়াতে মা শোবার জন্য ডাকতে এলে আমার তবে চৈতন্য ফিরল।

হায়, হায়, এ কী করেছি!

যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এতদিনে আমি একটা অ্যাব সার্ড রচনা লিখে ফেলতে পারলাম।

অতিথি

ও দিদি, ধপ্-ধপ্ পায়ের আওয়াজ ওঠে যে সিঁড়িতে? আঃ কী জ্বালা! সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দেখ সোজা।

গায়ের জামা-কাপড়টি খুলে সবে শুয়েছেন, না? পাখার নীচে আরামে চোখ দুটি বন্ধ। নীচে বসবার ঘর আছে, চাকরের ব্যবস্থা আছে, শ্লিপ দেবার বন্দোবস্তও রাখা। তবু অসময়ে অনাত্মীয় বা স্বল্প পরিচিত যদি উঠে আসেন সোজা, কি করবেন আপনি?

এঁরা চাকর-বাকরকে হটিয়ে দেন, 'আমি নিজেই যাচ্ছি' বলে। বসবার ঘরে বসতে চান না। বারান্দার আধুনিক বসবার ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। হট্ হট্ করে উঠে আসেন জুতো বাজিয়ে। যার কাছে আসছেন সে দ্বিপ্রহরের নিরালায় অথবা নিশিথিনীর আবির্ভাবে বেসামাল থাকতে পারে এঁরা মানেন না। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে নাম ধরে ডেকে এঁরা জানান দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না।

তারপর এসে বসলেন তো বসলেন। চা-খাবার এল। তিনি বার-দুয়েক টেলিফোন করে নিলেন ইতিমধ্যে। আহা, হাতেই

কাছে টেলিফোন—যন্ত্রটি পেলে তখন সকলেরি কাজ পড়ে যায়। প্রতিটি কলে যে পয়সা ওঠে উদারভাবে তাঁরা বিস্মৃত হন।

কেউ বা চেয়ার এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়েন শুভ্র বিছানায়। বালিশ চটকে, আস্তরণ গুটিয়ে পা তুলে দেন শয্যার বুকে। পড়ার টেবল বেছে উচ্ছিষ্ট পাত্র রাখেন টিপাই থাকা সত্ত্বেও। চিঠিপত্র, ডাইরি খোলা চিত্তে খুলে নেন।

যত কাজই থাক দিদি, আপনার অতিথি নড়বেন না। ঘরের কথাগুলি সাগ্রহে নথি করে নেবেন। ভবিষ্যতে অন্য বাড়ীর কর্ণে ঢেলে দিতে হবে কি না।

ওঁর টেলিফোন থাকলেও একটা টেলিফোনও না করে একগাদা অপরিচিত লোক নিয়ে এসে যাবেন অতিথি। তারপর, চাকর-বাকর থাকুক না থাকুক চা-খাবার যোগাতে আপনি হয়রান। কারণ, অতিথি বেছে বেছে চায়ের সময়ে লোক এনেছেন। তাছাড়া, অভাগতকে কিছু দেওয়া আপনার মজ্জাগত, অতিথি জানেন।

দিদি আপনি অতিথির জন্য কত বিব্রত হন জানি। রাত্রি নটায় এসে ফরমাস্ 'শিগগির এক গ্লাস লেবুর জল দিন।'

বেলা বারোটায় ফরমাস্, 'এক কাপ চা চাই।' আপনার খাবার সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে, আপনি গ্যাস্ট্রিকের রোগী কে মনে রাখে?

অতিথি খেয়ে-দেয়ে মুখে পান পুরে বার হয়েছেন। এ পাড়ায় বিকেলে কাজ সেরে যাবেন। অতএব রাত্রে ঘুম না হলেও অপনার হাজিরা দিতে হবে গোটা দুপুর বক্ বক্ করে।

কারণ দিদি, আপনার বাড়ীতে আপ্যায়ণের ভার নেবার অন্য কেউ নেই।

অতিথি আপনাকে বাড়ীতে ডাকেন কি না ডাকেন, সর্বদা আসেন নিজে। বাড়ী গেলেই খরচ চাকর-বাকরের অসন্তুষ্টি। অতএব নিজে খবরাখবর নেওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমার শৈশবে ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষার সময়ে আমার একজন অতিথি জুটেছিল। পাড়ার আধুনিক পরিবারের সদ্যবিবাহিতা বধূ। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে তিনি দয়া করে রাস্তা পেরিয়ে আড্ডা দিতে আসতেন নিত্য। বাড়ীতে লোকজন নেই একা লাগে।

মহিলা নিজে ম্যাট্রিক পাশ, স্বামী বিলিতি এঞ্জিনীয়র সেকালের বাজারে। আমার টেস্ট্ পরীক্ষার পরে পড়াশোনা করা দরকার। গৃহশিক্ষক নেই আমি ওর চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট। সবিনয়ে নিজের লেখাপড়ার জন্য সময় দরকার জানানো সত্ত্বেও তিনি গ্রাহ্য করেননি। অদ্ভুত পরিস্থিতি এখনও মনে আছে।

আমাদের দেশে অতিথিকে আমরা দেবতা বলে থাকি। বাড়ীতে অতিথি এলে আমরা যতই অসুবিধা হোক খুশী হই। বিজয়ার পরে মিষ্টান্ন বিতরণে সর্বস্বান্ত হলেও লোকে বিজয়া করতে না এলে অভিমান করি।

ধার করে মাছ কিনে মুখে বিপন্ন ভাব দেখিয়ে অতিথি-সৎকারে লাগি। এই আমাদের জাতীয় চরিত্র।

আমাদের শাস্ত্র বলেন ঃ 'ভূমায় সুখ, অল্পে নেই।'

কিন্তু বর্তমানে ব্যতিক্রম।

যৌথ পরিবার রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। নিজের নিজের ছোট গণ্ডী নিয়ে থাকতে থাকতে অনেকে ভুলে গেছি বাড়ীতে গেষ্ট-রুম্ থাকা দরকার। জওহরলাল নেহেরু The Discovery of India তে মানুষের গণ্ডী সংকীর্ণ হওয়ার বিষয় বলেছিলেন। সমাজের বৃহৎ জীবন থেকে স্খলিত হয়ে মানুষ নিজের ব্যক্তি সত্তায় অধিক মনোযোগ দিচ্ছে আধুনিক যুগে।

—"For each person life wss divided & fixed up a bundle of duties & responsibilities within his narrow sphere." ('The discovery of India')

এখন জীবন ও মানুষ আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। অনেকে

রাস্তা থেকে কুড়িয়ে অতিথি আনেন দেখেছি। আবার ঘাড়ে কেউ চাপবে এই ভয়ে অনেকে বিবর্ণ হয়ে ওঠেন।

তবু বলা চলে অতিথির স্থান আমরা জীবনে রেখে থাকি। কারণ ভূমায় সুখ মানতেই হয়। বসবার ঘর সাজিয়ে রাখি বিশেষ আসন দিয়ে। ভালো টি-সেট্, কফি সেট তুলে রাখি লোকজন এলে দেব বলে। অবচেতন মনে নিজেদের কয়েকজনের জন্য তৈজস কিনতে যেয়ে বাড়্তি লোকের ব্যবস্থার তাগিদ পাই।

এ কথা সত্যি 'ম্যান্ ইস্ এ গ্রিগ্যারিয়াস্ অ্যানিমাল।'

অতিথির প্রতি কর্তব্য আমাদের শেখা ও সকলকে শেখানো উচিত।

তেমনি অতিথিরও কর্তব্য আছে। সময় বুঝে চলতে হয়।

যদি বাড়ীতে অনুষ্ঠান থাকে, উৎসব অথবা পর্ব দিন হয়, শোকাবহ অথবা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে, তবে যেন অতিথি সাক্ষাৎদানে বিরত হন অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া। পারিবারিক কোন ব্যাপার থাকলে সসার-চোখ নিয়ে সেখানে যাওয়া ভাল নয়। আমার আর এক ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ঘুম থেকে উঠতেন বেলা নটায় একপেট ব্রেক্ফাস্ট্ দশটায়। দুটোয় লাঞ্চ।

তিনি বেলা দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত সাঙ্গপাঙ্গ-সহ আমার বৈঠকখানায় আড্ডা জমাতে আসতেন।

দুচারদিন লুচি, আলুর দম ইত্যাদি যোগালাম। যাবার সময় হয়েছে সবিনয়ে জানালে তিনি বলতেন 'ও তুমি ব্যস্ত হোয়োনা। আমার দেরীতে খাওয়া অভ্যাস।'

আমি যে তাঁর খাওয়ার জন্য নয় নিজের খাবার জন্য ব্যস্ত, সে কথা বোঝায় কে?

তিনি অবশ্য কিছুদিন পরে বিদায় হ'লেন। তাঁর সঙ্গে আমার কিছু টাকাও বিদায় হল।

না, না, তিনি বড়ঘরের মেয়ে। সে অর্থে বলছি না। আমি গ্যাস্ট্রিক-ট্রাবলে ভুগে চিকিৎসায় ব্যয় করতে বাধ্য হ'লাম। অত বেলা পর্যন্ত না খাওয়ার ফল।

লেখা ইত্যাদি আদায়ে আসেন যাঁরা, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু হাতে) তাঁরা পান চিবোতে চিবোতে পোর্টফোলিও হাতে হাজির হয়ে কাজ সমাপনান্তে সুখ-দুঃখের আলোচনায় বসে যান। লেখক-লেখিকার ঘড়ির দিকে তাকানো গ্রাহ্য করেন না। খুলে বলতে গেলেও চক্ষুলজ্জায় বাধে।

এই চক্ষুলজ্জার বালাই নিয়ে মরি আমরা মেয়েরা। রাত্রি দশটায় অতিথি চা-পানের বাসনা জানান। কফি তবু তাড়াতাড়ি করা চলে কিন্তু চা! ভেজাও, ছাঁকো। ভাল চা করতে গেলে এক্সপার্ট—চাকর-বাকর চাই বহু গৃহস্থ বাড়ীতে থাকে না। রাত্রি দশটায় চা করতে বললে অনেক ভৃত্য চটে ওঠে। কিম্ করোমি ?

দিদি, আপনার বাড়ীতে বাড়তি লোক নেই। অতএব অতিথিকে একা বসিয়ে মেরে-কুটে আপনি আপ্যায়নের যোগাড় করেন।

ভরা দ্বিপ্রহরে অথবা রাত্রে ফ্যাশানী যুবক হাজির হয়, 'দিদি মিষ্টি খাওয়ান' অথবা 'ক্ষিদে পেয়েছে, খাওয়ান।'

চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়েছেন, দোকান-পাট ঝাপবন্ধ অথবা পাড়ার ধারে কাছে নেই। কে শোনে ?

সেদিন নন্দিনীর বাড়ী গেলাম! যেয়ে দেখি গোটা বাড়ী তছ্‌নছ্। আধময়লা শাড়ী পরে সে কলঘরের দিকে যাচ্ছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে।

'এ কি ? কাপড়-চোপড় ছাড়নি ? ঘরদোরেরি বা এমন হাল কেন ?'

ক্লিষ্ট হাসি টেনে নন্দিনী বলল, আমার শ্বশুরমশাইয়ের এক বন্ধু এসেছিলেন। শ্বশুরমশাই নেই শুনেও ঘণ্টা দুই বসে রইলেন।

ছেলেটা স্কুল থেকে এল। ওঁর সামনেই তার জামা-কাপড় ছাড়িয়ে, খাইয়ে খেলায় পাঠালাম। ওঁর চা খাবার করে দিলাম। উনি আবার বাজারের খাবার খাননা। এইমাত্র গেছেন উঠে। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হল না। আবার কাল আসবেন বলে গেলেন। তা তুমি বোস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি এক্ষুনি কাপড়খানা ছেড়ে আসি। ও কি?'

আমি ততক্ষণ সদর দরজায়, 'রক্ষে কর। অন্য দিন আসব। এক দিনে এক অতিথিই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। Sufficient unto the day is the evil thereof.'

আমার বন্ধু ক্ষমা খবর দিল, 'ভাই, মিষ্টার ঘটকের জ্বালায় পারছি না আর। আমার স্বামী ম্যালেরিয়ার পর থেকে কানে কম শুনছেন। বললে চটে ওঠেন। মেজাজও দারুণ খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। চীৎকার করে ঘরের কথা বলতে হয়, ঝগড়া বেধে যায়। ঘটকমশাই কল দিতে এসে নড়েন না, কান পেতে শোনেন। পরে অন্য বাড়ী যেয়ে শুনি আমার গোপন কথা গোপন নেই।'

থাকগে, ও সমস্ত কথা। অতিথি যদি ঈষৎ বিবেচক হন, কত ভালবাসি তাঁকে!

খাবার টেবিলে বসে দাঁত খোঁটা, চায়ের কাপে হাত ধোওয়া, দৃশ্যমান পাপোষে পা না মুছে কার্পেট কর্দম চর্চিত করা, সোফার-কাপড়ে হাত মোছা, উঁকি দিয়ে রান্না ও ভাঁড়ার দেখা, অনুসন্ধান করে গুপ্ত তথ্য জানা মেনে নিই, যদি অতিথি দ্বিপ্রহর দেড়টা টু সাড়ে তিনটে বা দুটো টু চারটে সময় বাদ দিয়ে উদয় হন বা রাত্রি এগারোটায় বিছানার সুপ্তি থেকে টেনে না তোলেন।

কিন্তু, আরে ছি ছি, এ সব কি বলছি?

'Man is a gregarious animal' এ কথা আমার মত মানে কে, জানেই বা কে?

লোক ছাড়া আমি একদম থাকতে পারি না। সুতরাং আমি যা যা লিখেছি কোনটাই আমার বাড়ীর অতিথিদের উদ্দেশে প্রযোজ্য নয়। সত্যি বলছি, একটি কথাও চেনাজনের কথা নয়—বানানো স্রেফ বানানো।

দিদি, আপনি এ কথা সবাইকে বলে দেবেন, দোহাই আপনার।

আর বলে দেবেন অতিথি যে-কোন সময়ে যদি আসেন আমি ধন্য হব।

যে-কোন সময়ে যত খুসী লোক এলে আমি কৃতার্থ হব।

—:::***:::—

মহাশয়, এটা টী বোর্ডের বিজ্ঞাপন নয়, কফি-প্রচারের কসরৎ নয়, নয় চিনির দাম বেঁধে দেবার আন্দোলন। মহাশয়, আমি একটি নিরীহ প্রাণী, অথচ নেশায় প্রাণ দিতে বসেছি।

না, না, সে সমস্ত কিছু নয়। নেশাকে পেশা ধরে ভালমন্দ পানীয়ের আশায় অন্যের কার্বাডের সম্মুখে তীর্থের কাক হয়ে

তারকেশ্বরের ধন্না দিইনি। বাবা তারকনাথের আমি মন্ত্রশিষ্য হতে পারিনি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীও মহিষাসুর বধকালে মদিরা পানে শ্রমক্লান্তি অপনয়ন করেছেন :—

"তত ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা
পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব
জহাসারুণলোচনা॥

দেবী সহজ সারল্যে অসুরকে বলে দিলেন :—

"গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ়
যাবৎ মধু পিবাম্যহম্।"

আপনারা বলবেন, দেবী সংগ্রাম প্রাক্কালে সুরাপান করেছিলেন। আমি কি যুদ্ধ করছি?

হায়রে হায়, যুদ্ধ করছি না? অবিরত করছি, অহরহ করছি। মানুষের সঙ্গে বা "মানবিক" উপাদানের সঙ্গে যুদ্ধের কথা না বলাই ভাল। তবে নিরন্তর ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করছি যে একথা বলতে পারি।

অতএব আমি মাদক ক্ষেত্রে অনধিকারী বলা চলে না। না হয়, ধর্মকেই কর্ম বলে নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গান গাই—

'সুরাপান করিনে মন, সুধা খাই জয় কালি বলে'—নানাদিকে আলোচনা করে উপনীত হই সিদ্ধান্তে যে আমি একটা ক্ষেত্র তৈরী করতে পারি সুরাপানের পক্ষে।

কিন্তু, কে কি করবে?

একদা তাম্বুলসেবিনী মাতার পানের বাক্সে সুরভিত জর্দার সৌগন্ধে মোহিত আমি গোপনে দু-একটা "ওর নাম কি বলে—অপহরণ" (রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' দেখুন) করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের মত অবশ্যই শিক্ষককে ভেট দেইনি, নিজে গলাধঃ-

করণ করেছিলাম। ফলে, মাথা ঘুরে, পাখা খুলে মাথায় জল দিয়ে ধরাশায়ী। আর একদিন দোক্তাজাতীয় খেয়ে (এক চিমটি মাত্র, সত্যি বলছি) কানমাথা গরম হয়ে, গলা কুটকুট্ করে (বুনো ওল খাবার মত) মরি আর কি! বেশী খুলে না বলে জানাই যে, কোন নেশার পক্ষে আমি উপযোগী নই। শুধু একটি পানিয়ে মনপ্রাণ দিয়েছি, সেটি চা।

আচ্ছা, চায়ের মাহাত্ম্য কত!

সমগ্র সাহিত্যপরিধির মধ্যে চা-পাত্র ছড়াছড়ি। মহিলাদের চা-প্রীতি সর্বজনবিদিত। 'ইষ্টলিন' উপন্যাসে দেখা যায় বার্বারার মাতার ঘড়ির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিক্ষেপ। তিনি সাগ্রহে তাঁর কঠিন স্বামীর আদেশ প্রতীক্ষা করছেন কখন বৈকালিক চা প্রস্তুত হবে। রবীন্দ্রনাথের হেমনলিনীর চা-প্রীতির অসংখ্য পরিচয় পাই। 'চার অধ্যায়ের, এলাকে দেখি চায়ের আমন্ত্রণে চায়ের দোকানে: 'শোধবোধের' নলিনী এবং 'বাঁশরীর' বাঁশরীকে কেন্দ্র করে বহু চা-পান উৎসব গড়ে ওঠে। বঙ্গ সাহিত্যে যেখানেই পূর্বে সুবেশা রমণী এবং একখানি টেবিল দেখি, মনে হয় এখনি দুই পংক্তি পড়ে দেখা যাবে ভৃত্যবাহিত শুভ্র চা-পাত্র এবং নায়ক-নায়িকার চা-পানের অবকাশে মহৎ প্রেমের জন্মলাভ।

যথাসময়ে একপাত্র চা বহু সুকঠিন পরিস্থিতিকে সুকোমল করে তোলে। পার্ল বাকের 'গুডআর্থ' উপন্যাসে নায়ক ওয়াংলাং-এর নব-গৃহিতা পত্নী ও-লীন স্বামীগৃহের প্রথম প্রভাতে শয্যাত্যাগের পরে চা প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপনার প্রাথমিক সঙ্কোচ হ্রাস করে আনছে। এ পি হারবার্টের উপন্যাস 'ওয়াটার জিপ্সিতে' প্রথম পৃষ্ঠাতেই নায়িকা কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে চা বহন করে প্রতি ব্যক্তির চিত্তে আনন্দ দিচ্ছে।

শরৎচন্দ্রের বিজয়া চা প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখে কাণ্ডজ্ঞানহীন নরেন্দ্রের বাক্যজনিত ক্রীড়াকে বিদূরিত করতে চাচ্ছে।

অলমতিবিস্তারেণ। এখন চায়ের এই গৌরবময় পদ বিলুপ্ত রাজন্যভাতার প্রথায়। অতি দ্রুত চায়ের স্থান নিচ্ছে কফি—"Cawfee"! পথে-ঘাটে, ঘরে বাইরে এখন কফির ছড়া-ছড়ি। তাই ভাবছি পুরাতন উপন্যাসগুলিকে এডিননরাইটধারীদের অনুমতি নিয়ে আদ্যন্ত সংশোধন করি। চায়ের বদলে কফি বসাই, চা-প্রস্তুত প্রণালী বদলে কফি প্রস্তুত প্রণালী লিখে দেই।

কফি প্রস্তুত প্রণালী আবার কি? কোথায় কফিপাতা, কোথায় বা পারকোলেটর? ছেলেবেলায় কফি ধরে কিনে আনতাম মান্দ্রাজী দোকানের কফির গুঁড়ো। তারপরে নানা কসরৎ। ছোট-ছোট কাপ, সরু লম্বা কফিপট। এখন? ইনষ্টাণ্ট কফি সব বাজার মাত করছে। একটা কাপে এক নিমেষে তৈরী করে অভ্যাগতদের সম্মুখে ধরে ধরে দিচ্ছি। ভেজাওরে, ছাঁকোরে এসব হ্যাঙ্গামা নেই। ব্যয় বেশী হলেও গৃহিণীরা চায়ের বদলে কফি চাইলেই অধিক পীতা। যদি বাজারে ইনস্টাণ্ট চা ঠিকমত না মেলে তবে শীঘ্রই শতাব্দীব্যাপী চায়ের বাজার গেল বলে।

মান্দ্রাজী দোকানে কফির পাতা কিনতে যেয়ে সেকালে শুনতাম, 'চা খেও না, হজমের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কফি ধরো।'

আবার বিদেশী বলেন, 'কফি খাবার সময়ে অন্য খাদ্য যদি না পাও তবে নিজের কোটের বোতামটি গিলে তবেই কফি খাও।'

তাহলে কথা একই। খালি পেটে চা খেলে তবে অগ্নিমান্দ্য। খালি পেটে কফি খাওয়া নিষেধ মানে ফল এক।

নানা কথা ভেবে উনমন করে উঠি। লতাপাতা কাট। মনোহর চা-পাত্রে এক কাপ গরম চা ঢেলে খেয়ে নেই। মনে স্মৃতি জাগে অসংখ্য বনেদী চা-পার্টির। রূপোর টী-পট, দুধের জাগ, চিনিদানী, রূপোর চামচে, চিনি তোলার চিমটে। আহা! সেসব দিন কোথায় গেল?

কিন্তু বলুন তো, কফির কত সুবিধা। প্রস্তুত প্রণালীর সারল্য ভিন্নও ঠাণ্ডা কফি বা বরফদার কফি দেওয়া চলে। এক অতিকায় জাগভর্তি কফি কোনমতে তৈরি করে ঠাণ্ডা বাক্সে তুলে রাখুন। যথাকালে পার্টির সময়ে কাপে বা গ্লাসে ঢেলে হাতে হাতে দিন। কেউ খারাপ বলবে না। সেই সরপড়া হিমেল কফি সোনাহেন মুখ করে খেয়ে নেবে। অনভ্যস্ত রসনা পীড়িত হলেও কথাটি কব না। আমবা যে তাহলে সেকেলে প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারি। লোকের বাড়ী পুরনো রদ্দিধরা কফি বিশ্রীভাবে তৈরি হলেও বিকার নেই। কোনমতে গরম জলে গুললেই হোল। বাড়ী বাড়ী কফি খেয়ে বেড়াই। কারণ কফি এখন 'আলামদ,' কিনা চলতি ক্যাশন! সুগার বা চিনির কথা আসছে কেন? উভয় ক্ষেত্রে চিনি প্রধান ভূমিকা নেয় বহুমূত্রের রোগী অথবা হৃদয়রোগী ইত্যাদির ক্ষেত্র ছাড়া।

আরে মশায়, বুঝে-সুঝে চিনি দিন। চিনি খাওয়াবেন, না চা খাওয়াবেন, না কফি খাওয়াবেন? বাঙালীকে কৃপণ কেউ বলবে না। এ পর্যন্ত শৈশব থেকে লোকের বাড়ী যে অযুত-নিযুত কাপ চা কপি টেনেছি, তার একটাতেও চিনি কম পাইনি। বরঞ্চ অতিরিক্ত। চিনি যখন পাওয়া যেত না, তখনও পানান্তে পাত্রের নীচে অঢেল চিনির স্তূপ দেখে গৃহস্থের অপচয়ে শিউরে উঠেছি চা-দোকানে এক-আধটু চিনি চেয়ে নিলেও নিতে পারেন, আমি কিন্তু পাঞ্জাবী চায়ের দুধ চিনি দিয়ে খাদ্যের ঘাটতি পূর্ণ করে থাকি।

অতএব চা-চিনি-সুগার তত্ত্বে উপনীত হয়ে বুঝলাম আমাদের গৃহে প্রচুর চিনি আছে। তাই আমরা অধিকাংশ লোকই 'মুখমিষ্টি' মানুষ। মনে যখন রাগে ফুলি মুখে দন্তবিকাশ করে থাকি। লোককে বঁটি পেতে কোটার মত মনোভাব যখন, তখনও অমায়িকতায় বিগলিত বচন বাহিরে। হতেই হয়।

কিন্তু এই অপর্যাপ্ত চিনি কেন বিদেশীসুলভ পানীয়ে প্রদত্ত আহোরাত্র? কেন সে দেশের বস্তুকে সুমধুর করে তোলে না? চা-কফির বদলে অভ্যাগতকে অনেক কিছু দিতে পারি আমরা নয় কি?

উদাহরণতঃ বলি, বেল, বেলের পানা। শিবরাত্র আসছে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস আসছে, বেলের সীজন বা ঋতু।

তারপর ভাঙো, মাখো, দাও। আহা, কফির মত সহজসাধ্য না হোক, চায়ের মত উত্তপ্ত না হোক, দেশী পানীয়। কতটা কদর বেড়ে যাবে আমাদের স্বাদেশিকতার? ইংরেজি বর্জন করছি তবে চা-কফি বর্জন করব না কেন? লাগাও বেলের পানা।

এবার হয়তো আমার প্রতি ঢিল ছোঁড়া হবে। বিদায়।

—:::***:::—

ভিড়ের কারণ অনেক ক্ষেত্রে জাস্টিফায়েড্ নয়।

ভিড় কাকে বলে ?

কতকগুলি লোকের সমষ্টি যখন জটলা করে, ধাক্কাধাক্কি দেয় গম্‌গম কথাবার্তায় যখন দমবন্ধ হবার শঙ্কায় প্রাণ কাঁপে, ছিনতাই-এর অনুকূল পবন বয়ে যায়, তখন নেই জনসমষ্টিকি আমরা 'ভিড়' বলে অভিহিত করি।

এই ভিড় কমাবার, বাড়াবার উপায় আছে।

এই ভিড়ে কখনও সুবিধা, কখনও অসুবিধা ঘটে থাকে। ভিড়ে সুফল এবং কুফল দুই-ই পাওয়া যায়।

আজকাল ভেজাল খাদ্য অবিরত গ্রহণের ফলে কি না, কে জানে আমাদের মস্তিষ্ক জড় স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উদাহরণ ভিন্ন কথা যেন বুঝতে পারি না। চোখের সম্মুখে যা দেখব সেটাই আমাদের সত্য।

অতএব চাই উদাহরণ, চাই দৃষ্টান্ত। কি বলতে চাই বোঝাতে হবে। নিজের কথাই বলতে হচ্ছে ক্রমাগত। কারণ দর্শন আমার। কখনও চক্রাকারে, কখনও বক্রাকারে পরিভ্রমণ করতে করতে দুচোখে কত কি পড়ে যায়।

ভিড় কমাবার উপায় পরে বলব। সেটাই সকলে শুনতে চাইবেন। ভিড় বাড়াবার উপায়টা আগে বলা যাক।

ভিড়ের উৎপত্তি কেমন করে?

ভয়াবহ কিছু ঘটলে, নৈসর্গিক বিপ্লব হলে নানা ব্যক্তি কৌতূহলে ছুটে আসে, ভিড় জমে। গাড়ীচাপা পড়লে, মারামারি বাধলে যে ভিড় নিত্য দেখছি।

তাজ্জব বা বিচিত্র কিছু ঘটলে ভিড় জমে। দর্শনীয় ব্যক্তি হলে ভিড় জমে। হুজুগে ভিড়ে ছেয়ে যায়। ভিড়ের পশ্চাতে আছে সাংবাদিক মনোবৃত্তি। জানা, দেখা, কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্য।

তাহলে ভিড়ের প্রধান মনোভাব আমরা জেনে নিলাম। স্বাভাবিক প্রথায় ভিড় জমে উক্ত কারণগুলিতে।

কিন্তু এ সকল ব্যতীত ভিড় জমাই কোন্ উপায়ে?

একথা কিছু দেখার চেষ্টা করুন রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে। ফুটপাথের বেসাতি বা যা কিছু হোক না।

তৎক্ষণাৎ দেখবেন, আপনি কি দেখছেন দেখার আশায় অন্য একজন দেখতে আসবেন।

তারপরে আর একজন।

তারপরে আর একজন।

এমনি করে একটি ভিড় জমে গেল!

রাস্তায় দাঁড়ান, চেঁচিয়ে কথা বলুন। হয়ে গেল ভিড়! এই ভিড়গুলি কোন বস্তুর বিনা সাহায্যে আপনি শুধু হাতে একা জমাতে পারবেন। যদি হাত-পা নাড়াচাড়া করে কিঞ্চিৎ প্রাকৃত বনে যেতে পারেন, আরও বেশী।

ভিড়ে সুবিধা পাওয়া যায় কখনও। গা-ঢাকা দেবার এমন পন্থা কোথায়?

কু-কাজ করে সরে পড়ার ব্যবস্থায় তস্কর-রাজ্যে সুফল এনে দেয় ভিড়।

আবার ভিড়ের অসুবিধাও প্রচুর। সেগুলি এতই সর্বজনবিদিত ও উপভুক্ত যে বলা বাহুল্য মাত্র।

কুফলের ক্ষেত্রেও তাই।

তবে একবার দু'বার চোর-ডাকাত গাঁটকাটা-বাটপাড় এ-সব না হয়েও দু-চারটে সুবিধা পেয়ে থাকি বটে যথা : —জিনিষপত্রের দরদাম, দেখাশোনা করছি দোকানে যেয়ে। একঘণ্টা সেলসম্যান গলদঘর্ম হয়েও আমার মতি-স্থির করতে পারল না।

চক্ষুলজ্জায় বাধছে চলে আসতে কিছু না কিনে। অথচ না-পছন্দ জিনিষ দায়ে পড়ে কেনায় অর্থদণ্ড।

এমন সময়ে হঠাৎ কয়েকটি লোকের ভিড় জমে উঠল। ব্যস্, আমিও নির্বিবাদে হাওয়া হলাম।

আমার ভাগ্যে সেখানে চাই চারপাশে যেন একটা ভিড় জমে ওঠে।

আমার ভাগ্যই তাই।

জানি না, সুতিকাগারে ভিড় জমেছিল কিনা সেদিন, যেদিন বহু বহু বৎসর পূর্বে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম।

জননীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি দারুণ ক্রুদ্ধ, 'আমি তখন নিরীক্ষণ করে দেখেছিলাম না কি?' "জিজ্ঞাসা শুনে গা জ্বলে যায়। আমার তখন বলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!"

যাই হোক জিজ্ঞাসায় আলোকপাত না হলেও ঘটনার স্রোত দেখে ধরেই নেওয়া যায় যে, সেই স্থলে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল হয়তো।

নইলে যা করতে যাই, গোপনে অন্ত দশজনের মত পারি না কেন? সকলের চোখে পড়ে একাকার হয়ে যায়!

কলেজ জীবনে একবার নিছক রসিকতা করতে যেয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম।

সহপাঠিনীর বিবাহে সেজেগুজে নিমন্ত্রণে গেছি। চব্যচুষ্য আহারের পরে ট্রে ভরা পান-সিগারেট নিয়ে বন্ধুর ভাই এলেন।

'পান ?'

'না, পান খাইনে।'

তবে, এট চলবে ? রসিকতা করে তিনি সিগারেট দেখালেন।

জব্দ হ'বনা পণ করে সপ্রতিভ স্বরে বলে উঠলাম, "উঁহু, ও — চলবে না। বর্মা চুরোট পেলে চলত।"

এক মিনিট।

এক হাতে বর্মা চুরোট, এক হাতে দেশলাই বন্ধুর দাদা হাজির। উচ্চৈঃস্বরে লোকের মাথার ওপর দিয়ে বলে উঠলেন, "এই যে নিন। আপনি বর্মা চুরোট চেয়েছিলেন।"

ব্যস্, ভিড় জমে গেল আমারই চারপাশে। সভয়ে দেখলাম কলেজের অধ্যাপিকা প্রৌঢ়া ও খিটখিটে মুরলাদি। ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখছেন আমার দিকে চশমার মধ্য দিয়ে। ছাত্রীর বিবাহে অধ্যাপিকাদেরও আমন্ত্রণ হয়েছে কিনা।

পরের দিন টীচারস্ কমনরুমে আমার ডাক পড়ল! নির্জন ঘরটি তখন। দীর্ঘ উপদেশ দিলেন মুরলাদি। "ছিঃ, ছিঃ; কলেজের ছাত্রী হয়ে তুমি ধূমপান ধরেছ! এখনি বর্মা চুরোট! বড় হলে কি ধরবে তুমি, বল ? লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমার, অত লোকের মধ্যে আমারই ছাত্রীর এই আচরণ! রামো, রামো।"

আমি ব্যাকুল হয়ে বোঝাবার প্রয়াস পেলাম যে নিছক পরিহাস করে আমি চুরোট চেয়েছিলাম।

"সেটাতো আরও খারাপ। নেশার জিনিষ যত বিশ্রী হোক না চেয়ে লোকে পায়ে না। বিনা কারণে এমন রসিকতা করার মানে ? মিথ্যার আশ্রয় তো নিলেই। তা'ছাড়া একজন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সভ্যভব্য মেয়েরা রসিকতা করে না কি ? ছিঃ ছিঃ! তাও আবার লোকের ভিড়ে!"

আমি মরমে মরে গিয়ে চুপ করে রইলাম।

মুরলাদি বলে চল্লেন, "অবশ্য আমাকে সেকেলে ভেবো না। অনেক বিদেশী ভদ্রমহিলা ধূমপান করলেও জীবনে বহু কাজ করে গেছেন। তবে, বর্তমান যুগে ধূমপানে খারাপ রোগ হয় আশা করি, জানো!"

হা হতোস্মি!

সব থেকে ভিড় যাতে জমতে পারে—সেই ভয়াবহ ঘটনা কিন্তু সর্বদা নিভৃতে, অতি নিরালায় সম্পাদিত হয়ে থাকে, যথা নরহত্যা। আজকাল মানুষের জীবনের মূল্য নেই। যখন-তখন যে-কোন ব্যক্তির প্রাণ যাচ্ছে। কিন্তু গোপনীয়তার অন্তরালে। কারণ ভিড় জমলে আর ঘটনাটি সম্পাদিত হতই না মোটে।

পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। ভিড় কমাবার উপায়টি এখনও বলছি না কেন?

পূর্বেই জানিয়েছি যে, উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যকে পরিস্ফুট করছি। একটা দৃষ্টান্ত বলে দিলেই সকলে বুঝতে পারবেন।

চিড়িয়াখানায় গেছি। বড় বড় জন্তুর কাছে ভিড় জমা দেখতে দেখতে শ্রান্ত হয়ে কটি কাঠবেড়ালের খাঁচার ধারে একখানা শূন্য বেঞ্চ দেখলাম আমরা। সেখানে আর কে যাবে? বুনো কাঠবেড়াল লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করে নিজের মান নিজের মনে বজায় রাখছে।

আমার ছোটদাদা, তস্যঃ পত্নী, বড়দার সহধর্মিণী বড়বৌদি ও আমি।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে উঠল।

ছোটদা চারদিকে তাকিয়ে দিব্যি উচ্চগ্রামে বলে উঠলেন:—"এতটুকু জন্তুর কাছে এত ভিড় হওয়া উচিত নয় তো।"

এক-দুইজন সরে গেলেও ভিড় জমেই রইল।

তখন ছোটদা বুকে হাত রেখে চিতিয়ে বসলেন। কাতর

অথচ সুস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, "নাঃ, আজ কেন যে এলাম? ঘোরাঘুরিটা অন্যায় হয়েছে। পুরীতে এতদিন থেকেও কোন ফল হল না দেখছি!" এখানে খুক্-খুক্ কাশি একটু। তারপর করুণ স্বর, 'কাল বিকেলে, আবার জ্বরটাও এসেছিল।'

আর দেখতে হল না। কাঠবেড়ালীর কর্নার জনশূন্য নিমেষে।

অতএব ভিড় সরাবার একটা উপায় ভয়-দেখানো। "ঐ রে পুলিশ আসছে, গুলি চলবে। কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়বে। পালাই বাবা, প্রাণ নিয়ে।"

"বোমা পড়ছে, যাবেন না, যাবেন না ওদিকে।"

"পাগলা কুকুর ছুটছে। পালান, পালান।"

ইত্যাদি অনেক কথা, আমি আর কী বোঝাব, বলুন? আমি ভিড়ের মধ্যে উত্যক্ত হয়েছি। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কাজে লাগছে না। সুতরাং নতুন কিছু জানা থাকলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন। তা'ছাড়া, উক্ত কথাতেও অনেক ক্ষেত্রে অর্বাচীনকে রোখা যায় না, সে আরও উদগ্র হয়ে ওঠে।

ভিড়ের কথা আর কি বলব?

এই ভিড়ে ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে জীবনে প্রেম হল না। ওই আর একটি বস্তুর নিভৃতি প্রয়োজন। প্রণয়ের পরিণাম পরিণয়। তখন আবার লোক ডেকে জড়ো করা হয়। কিন্তু পূর্বরাগ নিছক গুপ্ততথ্য। অবশ্য রাধিকার পূর্বরাগ নিয়ে যা মাতামাতি, গান গাওয়া-গাওয়ি হয়েছিল, হিটলারের ইভা ব্রন প্রচারের যুগেও কল্পনা করতে পারতেন না।

আমি কিন্তু দেখেছি কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সদয় হওয়া মাত্র কেমন করে জানি উভয়ের চারদিকে ভিড় জমে যায়। উক্ত ব্যক্তি কিছু বলা মাত্র যেন অ্যামপ্লিফায়ারে প্রচারিত হয়ে যায়। সোরগোলে আমিই নিজে শুনতে পাইনা।

'বেবেলের' শব্দময় গম্বুজের অভিশাপে আমি অভিশপ্ত। ভিড় আমার আত্মগোপনের দুর্গ, ভিড় আমার আশ্রয়। একটা কবিতা লিখেছি, শুনবেন ?—

—জনতার মধ্যে আমি খুঁজি যে আশ্রয় উইলোর পাতা-ছাওয়া কুঞ্জবাস হ'তে। যেখানে আঁধার সন্ধ্যা নামে আদরেতে আমি খুঁজি চৌরঙ্গীর সজ্জিত বিপণি। বিদেশী পণ্যের ভিড়ে নিজেকে বিলয়।

:::***:::-

নামটি গুরুতর হলেও পাঠককে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি প্রবন্ধটি আদৌ গুরু নয়। 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' বলতেও পারেন। অতএব, ঠেলে সরিয়ে রেখে সিনেমা সংবাদ খুলবেন না।

ধর্ম কি ?

সকলেই তারস্বরে বলে উঠবেন : যা ধারণ করে আছে। কিন্তু আমি বলব : আমরা যাকে ধারণ করে আছি। অর্থাৎ বাইরে যা দেখাতে আমরা ব্যস্ত থাকি, নয় কি ?

কিন্তু এখানেও মতান্তর আছে। ধর্মের দুই প্রকার রূপ

আমার চোখে পড়ে সাধারণতঃ। আমরা সাধারণ লোক, সাধারণ মানুষের কথাই বলে থাকি। উৎকট যে আচরণ সেটা মনস্তাত্ত্বিক দেখবেন।

প্রথমে, দেখি বাইরে দেখানো ধর্ম একটা।

দ্বিতীয়তঃ, দেখি বাইরে গোপন রাখা ধর্ম একটা। এই ধর্ম প্রায়শঃ সংস্কারের রূপে প্রকটিত।

যত হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ কথা বলা হোক না, দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালে বক্তব্য যতটা পরিস্ফুট হয়, ততটা অন্য ভাবে নয়।

যা দেখেছি সেই সমস্ত কথাই বলা যাক। যে যার ধর্মে চলে। চোরের ধর্ম চৌর্য, সাহিত্যিকের ধর্ম রচনা, গৃহিণীর ধর্ম গৃহরক্ষা, ভৃত্যের ধর্ম কর্ম। এই রকম প্রায় সকলেই নিজ নিজ কর্মকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছে এবং অবিচলিতভাবে তদনুযায়ী চলেছে।

আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বধর্ম বিস্মৃত হই। ছুটে যাই নাচের দলে, গানের দলে, খেলার মাঠে, কলেজের চেয়ারে। আবার ফিরে আসি ঠিকই, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ অল্পক্ষণের জন্য হলেও ক্ষতি যা হবার হয়ে যায়।

নিজের কথা কেন ধর্মের আঙিনায় ঢোকাচ্ছ? ধান ভানতে শিবের গীত কেন?

কিন্তু আশৈশব নিজেকে কেন্দ্র করে বস্তুবিচার আমার অভ্যাস। বহু দিন কোন প্রথা চলার ফলে সেটাই ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। আপনারা যদি আমাকে অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেন তবে তো আমি কোটেশান দেবঃ 'স্বধর্মে, নিধনো শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। তবে চোরকে কিছু বলা উচিত নয়। চৌর্য তার ধর্ম।

আমি তো কিছু বলি না। এক চোর বাসন চুরীর কর্মে এল। গামছায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল থালা-বাটি-গেলাস, বাড়ীর যাবতীয় বাসনসম্ভার। হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল।

আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে শুধু প্রস্তাব দিলাম

'এতগুলো জিনিষপত্র বয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে? গাড়ীখানা বার করতে বলি?

অন্যদের যা করবার করেছিল। আমি আর একটি কথাও বলিনি। কারণ, আমি জানি চুরি চোরের ধর্ম।

এই প্রসঙ্গে একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির কথা উল্লেখ করতে পারি। আমার পিসতুতো দাদা শিবুদা। চিন্তার মৌলিকত্বের জন্য এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

আমাদের বাড়ি ভর্তি বড় বড় অতিকায় টিক্‌টিকি। এ বাড়ীতে জন্তু-জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত। শ্বেতহস্তী ও তিমি মাছ ভিন্ন অনেক কিছু আছে। চড়াই, কাক, শালিক, বুনোটিয়া (লেক নিকটস্থ হবার দরুণ) আসে হরদম। গোসাপও সম্মুখের ঝোপে দেখেছি। দেখেছি ব্যাঙ ছুঁচা ঘুরে বেড়ায়। ইঁদুর ও বেড়ালের তো কথাই নেই। কেঁচো, কেন্নো থেকে সুরু করে মরকুটে সাপের বাচ্চা পর্যন্ত আমি নিজের চোখে দেখেছি। বাড়ীর লোকেরা অবশ্য বিশ্বাস করেন না, বেশী বললে তাঁরা চটে অস্থির হন। যেন তাঁদের সাধের বাড়ীর আমি মানহানি করছি।

আরশোলা, প্রজাপতি, ফড়িং, মশা, মাছি, গুবরে পোকা, কাঁচপোকা, ছারপোকা, সর্বপ্রকার পিঁপড়ে, ডাই, বোলতা, মৌমাছি, উইপোকা, রূপোলী পোকা, শুঁওপোকা, বিছে, চ্যালা, কাঁকড়াবিছে প্রভৃতি জগতের সৃষ্ট যত পোকা এখানে দেখেছি। কুকুর নানা প্রকার আসা-যাওয়া করে, গরু-বাছুর গেট খোলা পেলেই প্রবেশ করে, কার বা পোষা বানর যখন-তখন হানা দেয়। আর কত বলব? ছবির পেছনে চামচিকের বাসা।

এহেন বাড়ীর দেওয়ালে বিরাট টিক্‌টিকি একটা পোকা ধরবে, বিচিত্র কি?

আমি কাতর হয়ে যন্ত্রণার্ত পোকাটাকে রক্ষার্থে টিক্‌টিকিকে তাড়া দিতে গেলাম।

শিবুদা উপস্থিত ছিলেন। বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরে গতিকে বাধা দিলেন।

"না, মোটেই না। ওটা টিকটিকির ধর্ম। ওর খাদ্য থেকে ওকে বঞ্চিত করার অধিকার তোমার নেই।"

তারপর থেকে বাড়ীর মধ্যে ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ শব্দ শুনলে আমি এগোই না। কোনও জানোয়ার কোনও জানোয়ারকে ধরছে, বুঝতে পারি। ভয় বা ঘৃণা আমার নিবৃত্তির কারণ নয়। আমি অন্যের ধর্মে বাধা দেই না।

যাই হোক, ধর্মের ভিতর ও বাহিরের রূপ আমি এখন দৃষ্টান্ত দ্বারা বলতে চেষ্টা করব।

আমার পরিচিতা, ধরুন, ক-নাম্নী কোন আধুনিকী। তিনি কপালে সিঁদুর পরেন না, অথচ লক্ষ্য করলে মাথার মধ্যস্থলে সিঁথির ওপর ক্ষীণ চিহ্ন। হাতে শাঁখা নেই, লোহা সোনায় মোড়া, বালার আকারে যাতে বোঝা না যায়। ইনি সংস্কার বর্জিত হতে পারেন নি, অতএব ধার্মিক (দোহাই পণ্ডিতমশায়, অতি কথ্য-সাধারণ অর্থে 'ধার্মিক' শব্দটি ব্যবহার করছি)। কিন্তু বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ। ভেতরে ধর্ম গোপন। এঁরা অসবর্ণে বিবাহে উপযুক্ত পাত্র পেলে আপত্তি করেন না। কিন্তু বিবাহের দিনক্ষণ দেখেন ও কুশণ্ডিকার যাগযজ্ঞও করেন। জ্যোতিষীর বাড়ী এঁদের ধাবন ক্রমাগত। মুসলমান পাত্রেও এঁরা হিন্দুমতে কন্যা সম্প্রদান করে থাকেন অথচ মনোব্যথা, ব্যবসায়ের বিপর্যয়ে ছুটে যান জ্যোতিষী বাড়ী। এঁদের স্বামীরা পৌত্তলিক ধর্মে অরুচি দেখান ও তীব্র মন্তব্য করেন। অথচ স্ত্রী আনীত মাদুলী কবচে গোপনে বাহু ও বক্ষ অলঙ্কৃত করে থাকেন। বার বার এঁরা বিদেশ যান, সাহেবসুবোদের ডিনার দেন। মাথায় বিদেশী কেশ-সজ্জা—সহপত্নী নাচের স্টেপ রপ্ত করেন, নইলে চাকরীতে ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু স্বামী জামার নীচে সরু গোটহারে গুরুপ্রসাদী নির্মাল্য ধারণ করেন।

একবার একটু বিপদে পড়েছিলাম এঁদের একজনকে নিয়ে। শ্রীমতী খ—দারুণ স্মার্ট, ইংরাজী স্কুল-কলেজে পড়েছেন। ওঁকে এক রেষ্টুরেণ্টে চা-খাওয়াতে বসিয়েছিলাম।

দিব্যি হাসিখুসী মহিলা হঠাৎ কেমন মিইয়ে যেয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লেন, "আমি—আমি আজ কিছু খাব না আপনি খান।"

"কেন?"

"আমার বাধা আছে।"

"পেটের গোলমাল নাকি?"

ভদ্রমহিলা ক্রমাগত পেড়াপেড়ির পরে বলতে বাধ্য হলেন। আজ মঙ্গলবার, তিনি মঙ্গলবার করে থাকেন। নিরামিষ খেয়ে। পেয়াজ-রসুনও চলে না। ফল-মিষ্টান্ন হলে চলবে।

মহা বিপদ। বসে পড়েছি আমরা, ওঠাও যায় না। অবশেষে কলা পাওয়া গেল, কিছু মিষ্টান্ন আনানো হল। আমি একা-একা গবগব করে মাংসডিম গিললাম। মহিলা ছুরি দিয়ে কেটে কাঁটায় গেঁথে সম্মুখে বসে অতি বিশুদ্ধ মঙ্গলবার পালন করলেন।

যাকগে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণে বক্তব্য ভারাক্রান্ত করব না। বাহিরের ধর্ম বিষয়ে সামান্য একটি উদাহরণ দেই। এটীও প্রাতঃস্মরণীয় শিবুদার জ্ঞানলব্ধ।

উত্তেজিত শিবুদা বল্লেন, "জানো, কি ব্যাপার? ধর্ম ধর্ম করেই ভণ্ডামীর রাজ্য চলছে।"

শিবুদার বন্ধু দয়াল দত্ত বেজায় বাজারে-খাবার ভালবাসেন। শিবুদা পকেটের সামর্থ অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন সহ বন্ধুবাড়ী যান।

সেদিন গরম লুখানা আলুর চপ নিয়ে গেলেন। দয়ালের বাবা মাছ মাংস ছোন না। পুত্রের উক্ত নিষিদ্ধ খাদ্যে আসক্তি হেতু এক বাড়ীর মধ্যে ছেলের সঙ্গে পৃথক হয়েছেন।

দয়ালের বাবার অঙ্গে নামাবলী কণ্ঠে কণ্ঠি, কপালে চন্দন ললাটে-নাসিকায় দীর্ঘ তিলক। মুখের বুলি সর্বদা 'জয় গুরু' রব।

দয়াল বাড়ী নেই। বৈঠকখানায় বাবা বসে আছেন। শিবুদা চপের ঠোঙা টেবিলে রেখে অপেক্ষায় বসলেন।

ইতিমধ্যে আর একটি ভদ্রলোক অনুরূপ বেশে উদয় হলেন। 'জয় গরু' রবে তাঁরা পরস্পরকে সম্ভাষণ করলেন। দয়ালের বাবার বন্ধু।

কিছুক্ষণ পরে বাবা প্রশ্ন করলেন, 'ঠোঙায় কি ?"

"আলুর চপ।"

"পেঁয়াজ আছে মধ্যে।"

শিবুদা বল্লেন, "কি করে বলব ? থাকাই সম্ভব। যে থালা থেকে তুলে দিল, সেখানটায় চিংড়িমাছ ভাজা ভর্তি ছিল গায়ে গায়ে। পেঁয়াজ দেওয়াই সম্ভব।"

বাবা একটুক্ষণ তাকিয়ে রায় দিলেন, "না, নেই। দয়াল তো বাড়ী নেই। এগুলো আমারই সেবা করি।"

তিনি একখানা বন্ধুকে দিলেন, দুজনে চপ্ মাথায় ঠেকিয়ে বদনসাৎ করলেন চক্ষের পলকে, 'জয় গুরু' বলে।

অবশ্য এটি সত্য ঘটনা হলেও আমি এর দ্বারা ধার্মিককে কটাক্ষ করছি না। যে কোন মানুষ যদি বাইরের ধর্মকেই আঁকড়ে মনকে সংযত না রাখেন, তাদের এমন দশা হয়ে থাকে।

তবে হ্যাঁ, একটা ধর্ম প্রত্যেকেরি মানা উচিত—জীবে দয়া।

সেই জন্যই আমি যাবতীয় কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ারকে আমার বাড়ীর অংশ ছেড়ে দিয়েছি। রাত্রে শয়নকক্ষে ছুটোপুটি শুনলে বিচলিত হই না, পাশ ফিরে শয়ন করি। কুটকুট শব্দে ইঁদুর পাণ্ডুলিপি কাটে, নিঃশ্বাস আস্তে ফেলি পাছে ভয় পেয়ে পালায়। ছারপোকা মরে যাবে ভয়ে বিছানা চাদর রৌদ্রে মেলি না। পড়শীর পোষা বাঁদর বাড়ী চড়াও হয়ে তছনছ করলে সবিনয়ে

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে লীলা দর্শন করি। বেড়াল মাছ খেয়ে যায়, গরুবাছুর গাছ খেয়ে যায়। নিষেধ আছে মারধোর করা। রাগ হলে মনে মনে আওড়াই সেই বাণী :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
দূরে কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে সেইজন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট আদর্শ আমাদের পশ্চিমবাংলার পুলিশ দেখিয়েছেন। নরহত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই নারীনির্যাতন, চুরি, মারামারি হয়। যারা উক্ত কাজগুলি করে তাদের ধর্ম তাই। বাধা দিওনা। এছাড়া জীবে দয়া করা সর্বধর্মের সার। অতএব দয়া করে এদের ছেড়ে দাও, এরা নির্বিবাদে দয়াধর্মের জয়গান করে নির্দয় হয়ে উঠুক।

—:::*:::—

"বলিছে সোনার ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক, সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায় যা কিছু করার আছে করে ফেলো ঠিক।"

সময় তাই বলে ঠিকই। কিন্তু কতজন আমরা পারি যথাযথ কর্ম যথা সময়ে করে ফেলতে? সময় নিয়ে সর্বদাই আমরা বিপদে পড়ে থাকি। বিপদ দুইভাগে আসে।

আমরা সময়কে কর্তন করি।

সময় আমাদের কর্তন করে।

অর্থাৎ প্রাঞ্জল ভাষায় বলা চলে, আমাদের সময় কাটানো নিয়ে দায়। সময় কাটে না। কাটাবার নানা প্রণালী বার করি। সময়কে কেটে ফেলি। অন্যদিকে সময় আমাদের কেটে দেয়। আমরা সময় পাই না মোটে। খণ্ড-বিখণ্ড সত্তা বিভিন্ন কর্মে দিতে হয়।

যার ভাগ্যে যখন যেমন ঘটে।

একই লোকের ভাগ্যে নানারূপ ঘটতে পারে। যথা আমাদের স্বর্গগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কথা দেখি না কেন?

যৌবনকালে জেলে প্রচুর সময়। দুহিতাকে পত্রসাহিত্য লেখার সময় ছিল।

কিন্তু শেষ বয়সে? দুঃখ করে ভগ্নীকে বলেছেন যে, একখানা ভালো বই পড়বার, বা একদিন রেষ্টুরেণ্টে খাবার পর্যন্ত সময় নেই তাঁর। টেবিলে কবিতাংশ রাখা ছিল :—

"Miles to go before I sleep." —

নেপোলিয়ঁর জীবনে দেখুন না। সৈন্যাধ্যক্ষ্য সেনাপতি থেকে ফরাসী সম্রাট। সময় নেই। আবার শেষ জীবনে সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে বন্দী।

পূর্বে সময় কেটে কেলত তাঁকে, তখন তিনি সময়কে কাটলেন।

সময় কাটানো দায় হয়ে উঠল।

অবশ্য নাপোলিয়ঁ বা নেপোলিয়নের সম্পর্কে একটি কথা বলা চলে। যতই ব্যস্ত তিনি থাকুন না কেন প্রেমজীবন যাপনে সর্বদা সময় পেতেন তিনি।

আপনি পারবেন না কি? ওই অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ উচ্চাশা, ষড়যন্ত্রের আবর্তের মধ্যে? টুপী খুলে ফেলুন মহামহিমান্বিত ফরাসী সম্রাটের স্মৃতির উদ্দেশে তবে।

বিদ্যাপতি বলেছেন :—

"আধ জীবন হম নিদে গোঙাইনু—" নিদ্রায় সুদীর্ঘ সময় যায় নিশ্চয়। না যেয়েও উপায় নেই। নিদ্রার অভাব দেখলেই আমরা স্লিপিং পিল খাই, ডাক্তার বাড়ী যাই। যাঁরা অনিদ্রায় ভোগেন তাঁরা প্রচুর সময় পান। কিন্তু সেই সময়কে কাজে লাগানো যায় না। শরীর বিদ্রোহ করে।

শৈশবে সহপাঠিনীদের রাত্রি জেগে পড়া দেখে ঈর্ষান্বিত হতাম।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম অনিদ্রা রোগের বর চেয়ে। ঈশ্বরের অফিসে কাজকর্ম সরকারী দপ্তরের চেয়েও বিলম্বিত। আমার সেই লালফিতে বাঁধা ফাইল উন্মোচিত হয়ে মঞ্জুর হল যখন তখন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়েকটি পরীক্ষা হয়ে গেছে। অনিদ্রায় ছটফট করে কতকগুলি পেটেন্ট ঔষধের বাঁধা খদ্দের হলাম। সময় কাজে লাগল না।

অতএব বিদ্যাপতির দার্শনিক বচন আমি খণ্ডন করি। অর্ধেক জীবন নিদ্রায় না কাটালেও কোনও লাভ হয় না। ঈশ্বর-চিন্তা তখন আসে না, উল্টে ভগবানকে গালাগালি দেওয়া হয়।

সময় এক দ্রুতগামী অশ্ব, অনেকেই বলেন।

তাহলে কি করব ?

লাফিয়ে উঠে অশ্বের গলায় লাগাম পরিয়ে ধরে রাখব,—হে চঞ্চল, তুমি অচল হও।

যদি উক্ত অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ায় সময়াশ্ব স্থির হত, কি করা যেত ?

যাদের প্রচুর সময় আছে, অনন্ত সময় আছে, তারা কিছু করে উঠতে পারছে না কেন ? কারণ, গতি স্তব্ধ হলেও ক্ষতি নেই। প্রবৃত্তি বা অনুপ্রেরণা নেই।

আমার অনেক সময় আছে, অনেকেই বলে থাকেন আমিও দেখি তাই। কিছু না করে ব্যস্ত থাকবার আর্ট আমার আয়ত্ত। তবু আত্মদর্শনের কঠোর দিনে আমি হা-হুতাশ করি, আমার কিছু হল না বলে। সময় অঢেল, স্বীকার করি। তবু হল না রামপ্রসাদী সুর তুলি কণ্ঠে :—

"মন, তুমি কৃষিকাজ জাননা,
এমন মানবজমি রইল পড়ে,
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

সোনাটা ফলানো গেল না, সময় কাটালাম, সময়ও আমাকে কেটে গেল। ক্ষতি হল না। আমাকে উদ্দেশ করে বন্ধুদের ঈপ্সিত, নানা গান শুনেছি। বাইরের লোকেরও উপদেশ পেয়েছি। পরে বলছি।

আমি বিদ্যাপতির মতে মত দেই না, দিতেই যে হবে এমন

বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করা হয়নি। অর্ধেক জীবন নিদ্রায় কাটালাম, বেশ। বাকী অর্ধেক কাজ করলাম। কিন্তু বাকি অর্ধেক কাজের কাজ কজন করি?

অন্যেরা কাজ করে। সেই কাজ পরিচালনায় অফিস খুলে চেয়ার টেনে বসি। হিসাব রাখার ভার নেই, নিয়ন্ত্রণ করি বা করার চেষ্টা পাই। ছাত্র বাড়ীতে পড়ে নেবে ঠিক পরীক্ষা পাশের জন্য, অতএব নিশ্চিন্ত মনে তাদের পড়াবার ভান করি বা প্রয়াস পাই। মাষ্টারমশাই, মাপ করবেন। আমিও কিছুদিন ওই পেশায় ছিলাম কিনা। রোগীকে রাখেন হরি, মারেন হরি। আমি শুধু ঘড়ির দিকে চোখ রেখে নাড়ি দেখি।

সময় ওপর থেকে দেখে, হাসে। আর ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যায়।

বাকি সময়টা কাজের ফাঁকে আমরা কলহ করি। প্রাণপণ কলহ।

প্রথমে নিজের সঙ্গে। অতঃপর সকলের সঙ্গে। পরিজন, বন্ধু, প্রতিবেশী, দোকানী, মুদি, কখনও বাস-কণ্ডাকটার ইত্যাদি, আর কত বলব? একজন ইংরেজ লেখিকা বলেছেন : ট্রেডস্ পিপলের সঙ্গে কলহ জীবনে আনন্দ যোগায়।

এছাড়া, দাম্পত্য কলহের জন্য একটা বাড়তি সময় সকলকেই দিতে হয়। এটা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ধরে নিয়ে সময়ের একটা অংশ তুলে রাখতে হয় কাগজে মুড়ে। যত প্রগাঢ় প্রেম, তত নাকি কলহ। বলতে পারব না। একবারও বিয়ে করিনি কিনা।

যাকগে অনেকক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি। যা পরে বলব বলেছিলাম, বলে দিয়ে বক্তব্যটা শেষ করে ফেলি।

সদ্য সিনেমাপত্রগুলি তখন আত্মপ্রকাশ করছে নিত্য নূতন। দেখা গেল কোয়ালিটি অপেক্ষা কোয়ান্টিটি বরণীয়।

একজন তরুণ কোনও এক সিনেমা পত্রের পক্ষ থেকে লেখা নেবার উদ্দেশে যাতায়াত করতেন।

আমি যখন তাঁকে সবিনয়ে জানালাম যে, তাড়াতাড়ি বড় গল্প বা উপন্যাস এত পরিমাণে লেখা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। ছেলেটি বলল, 'তা কি হবে? লোকে যা চায় তেমনটি দিতে না পারলে চলে নাকি? দিন কিনে নিন, দিদি, দিন কিনে নিন।' আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি দিন কিনে নিতে পারিনি।

অন্য পর্যায়ে কোনও এক সময়ে আমাকে দেখা মাত্র হিতৈষী জন এই গানটি গেয়ে উঠতেন—

'জীবনে পরম লগন কোর না হেলা
কোর না হেলা, হে গরবিনি!'

আমার জীবনে পরম লগন যে আমি হেলা করেছি সবাই জানেন। সে কথা কালি কাগজ খরচ করে কাগজে ছাপিয়ে লোককে জানাবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যদি হেলা না করতাম? যদি সময়-তুরঙ্গকে চেপে ধরে লাগাম পরিয়ে পিঠে চেপে বসতাম, কি পেতাম? কি পেতাম জানি না। কিন্তু কি না পেতাম ঠিক জানি।

আমার এই অকাজে ভরা, মধুর আলস্যে খেয়াল ভেসে যাওয়া অকেজো দিনগুলি কোথায় পেতাম?

—:::***:::—

বিশ্ব ভুবন ব্যেপে একই চেষ্টা অহরহ—ইম্‌প্রুভমেণ্ট কিনা উন্নতি। এ উন্নতি প্রগতি অথবা অগ্রগতি নয়, নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় বা উপবিষ্ট অবস্থায় নিজের যা কিছু তার উপর নূতন কলম ফলানো। চলতি কথায় ঘষামাজা। হরিদ্বারবাসী আমার পরম দার্শনিক শিবুদা ঘোর শীতে সেই দেবলীলার স্থান ছেড়ে কিয়ৎকালের জন্য মর্তলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যুগান্তরের চক্রবক্রে 'সময়ের' উপর আমার লেখাটি পড়ে নাসা কুঞ্চিত করলেন, 'এ আবার কি একটা ভালো লেখা হল না কি? তোমার দোষ যে তুমি লেখাটা শেষ করেই কলমে ক্যাপ লাগিয়ে মুখ ফিরিয়ে বোস। একটু ইম্‌প্রুভ কবার চেষ্টা পাওনা। আমি বল্লাম, একটা ছোট চিন্তালহরী বা রিফ্লেক্সন। এটা আবার কি ইমপ্রুভ করব?'

'না, না, ঘষামাজা দরকার। বুঝলে না গোটা জীবন ধরে ঘষামাজা করলে তবেই মৃত্যুর আগে একটা রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। তোমার, দোষ কোন চেষ্টা নেই কোনদিকে। একবার হল তো

হল। না হল তো গেল। ছেড়েই দিলে। মুখখানায় একটু ক্রীম পর্যন্ত লাগাও না। অথচ আমার মেয়ে ডাক্তারী পড়লেও এদিকে নজর রাখে।'

শিবুদার ডাক্তারী—পড়ুয়া সুন্দরী তরুণী কন্যার কথা স্মরণ করে হেসে বল্লাম, 'কি যে তুলনা দিচ্ছেন? এখন আর ওসব চেষ্টা চরিত্র করে লাভ কি? যখন করবার তখনই তেমন কিছু করতাম না।'

শিবুদা সোৎসাহে বললেন, 'আরে' এখনই তো দরকার। প্রকৃতির সাহায্য কমে আসছে তো। স্বভাবগত আলস্য তোমাকে খেল দেখছি। ঘষামাজা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ কতটা ঘষা-মাজা করতেন, বল তো? তবেই তো নোবেল প্রাইজ পেলেন। তুমি একটা পত্রিকার বাৎসরিক প্রাইজ পর্যন্ত পাও না।'

দুঃখিত হয়ে বল্লাম, 'কি আর করা যাবে? তা, 'সময়' লেখা-টার কোন্ ঘষামাজা চলত?'

"দু-চারটে উদাহরণ না দিলে অ্যাবস্ট্র্যাকট বস্তু বোঝানো শক্ত। দাঁড়াও, আমিই বলছি। নেপোলিয়নের উদাহরণ দিয়েছ ঠিক। কিন্তু কজনে নেপোলিয়নের অন্তরঙ্গ জীবনের কথা জানে? ক'জনে নিজের সঙ্গে ফরাসী সম্রাটের তুলনা করতে পারবে? তোমার উচিত ছিল স্রেফ ঘরোয়া লোকের সময় কাটাবার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চালানো।"

"এখন যা হয়ে গেছে তা নিয়ে—"

শিবুদা বাধা দেন, "যা হয়ে গেছে সেটা দেখেই তো ইমপ্রুভ করতে হয়। নইলে শব্দটার মানে থাকে নাকি? উইলে যেমন কডিসিল থাকে, তেমনি ১৭ই জানুয়ারীর রবিবাসরীয় যুগান্তরের চক্রবক্রে যা 'সময়' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে, তাকে এক-দু মাস পরে ঘষামাজা কর। আমি উদাহরণ বলে দিচ্ছি।"

আমি হতবাক হয়ে শুনতে লাগলাম।

'সাধারণ লোকের সময় কাটাবার একটা রীতি বলে দিলেই চলবে। শোন, সংক্ষেপে বলছি। আমি হরিদ্বারের যে আশ্রমটায় থাকি সেখানে দুইজন বৃদ্ধ বাস করেন। রোজ বিকেল চারটায় নিয়মিত ওঁরা বেড়াতে বার হন, সন্ধ্যাবেলায় ফেরেন। যান একটু দূরে ব্রিজটার কাছ পর্যন্ত, ভালো করে জানি। অথচ এতটা সময় লাগে কেন রে? সময় এতটাই কেটে যায়? অবশেষে একদিন পিছু নিলাম। দেখলাম যেতে যেতে দুজনে অনর্গল গল্প করছেন। কিন্তু পদ্ধতি অন্য রকম। একজন একটা কথা বলা মাত্র থেমে যেয়ে দু'জনে সেই কথাটা নিয়ে আলোচনা করছেন। তারপর আবার হাঁটছেন। দু'পা যেয়ে আবার থেমে গল্প করছেন। কথা বলতে বলতে ওঁরা হাঁটতে পারেন না। তাই এত দেরী হয় দেখ, কতভাবে সময় কেটে যায়।'

শিবুদার কথামত আমি ঘষামাজা করে 'সময়কে' শোভিত করলাম। কিন্তু হায়, নিজেকে যে কিছুতেই ইম্‌প্রুভ করতে পারছি না। কত লোক কত কাল থেকে আমার পেছনে লেগে থাকলেও কিছু হয়নি।

শৈশবের সহপাঠিনীকে মনে পড়ল।

তার উদার ও মহান চেষ্টা ছিল সর্বদা আমাকে ইম্‌প্রুভ করবার। হয়তো সুন্দর গোলাপী রেশমের একটি জামা পরে স্কুলে গেছি, সবাই দেখে ধন্য-ধন্য করছে। ও নাক কুঁচকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পরে বলে উঠল নীল রংয়ের জামা কিনলে না কেন?'

আমার শাড়ীর পক্ষে যেখানে গোলাপী রং দরকার, সেখানে নীল কেন কিনব, আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।

একদিন কোন উৎসব ক্ষেত্রে নূতন ধরনে চুল বেঁধে গেছি, সবাই প্রশংসা করছে, 'বা, বেশ দেখাচ্ছে', হ্যানো-ত্যানো। ও একটুক্ষণ চুপ থাকার পরে মত দিল, "আর একটু ঘাড়ের কাছে নামিয়ে চুলটা বাঁধলে না কেন?"

যেটা করা হয়েছে সেটা যদি প্রশংসনীয় হয়ে থাকে অতঃপর ঘষামাজা করে কোন মূর্খ ?

সেই শৈশবে অবচেতন মনে গেঁথে গিয়েছিল সত্য, আমার কোনটাই যথেষ্ট নয়, আরও ভালো হওয়া দরকার।

কিন্তু শৈশবসঙ্গিনী সর্বদা বহিরঙ্গ আলোচনায় তৎপর ছিলেন, (যে বয়সে সেটাই স্বাভাবিক) মানসিক ফসলে হাত লাগাননি বলে অদ্যাপি বাহির নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। শিবুদার কথায় অন্যদিকে চেতনা পেলাম।

আয়নায় মুখ দেখতাম আর বিরক্তের একশেষ হতাম, শৈশব-সঙ্গিনী প্রণতির একদিনের আক্ষেপ মনে পড়ে যেত। স্কুলে একদিন আমরা প্রাণপনে সাজসজ্জা করছি, ওখান থেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ক্লাসরুমে ছুটির পরে দরজা বন্ধ করে কেশবিন্যাস হচ্ছিল। প্রণতি ডেস্কে বসে একখানা হাত-আয়নায় মুখে ঘষামাজা করছিল। গোলাপী পাউডার চেয়ে নিয়ে বিলেপন করল। আবার যেন কি কি লাগাল। শেষে আয়না আছড়ে ফেলে আক্ষেপে বলে উঠল, 'দূর ছাই, যাই করি এমন বিকট দেখায় কেনরে ?'

আমার নিজের বিষয়ে সেই মত হওয়ায় বিপদে পড়েছিলাম। চুল পার্ক ষ্ট্রীটের হেয়ার ড্রেসার দিয়ে কয়েকক্ষেপ সেট করলাম। কছুদিন পরে আবার নিজেকে নিয়ে অসন্তুষ্টি হওয়ায় থিয়েটার রোডে চুল কেটে পার্ম করে এলাম। কিছুতেই কিছু না। আদি ও অকৃত্রিম আমি এখন। লাভের মধ্যে হেয়ার-ড্রেসারের ঘরে টাকা উঠল।

জামা-কাপড়ের, গহনার ফ্যাসান নিয়েও উক্ত কথা। এখন হাল ছেড়ে পাল গুটিয়ে চুপচাপ স্রোতের ধারে বসে আছি।

আমরা সকলেই বেশীর ভাগ ঘষামাজা কিন্তু বাইরেই করে থাকি, নয় কি ?

আমার এক বন্ধুর বাড়ীর-কথা বলি, বসতবাটী।

একদিন দেখলাম কাল্‌চে গোছের রং লাগানো হয়েছে, আদি লাল রংয়ের উপর। পরের বছর বাড়ীটি হরেক রংএ বিচিত্রটি দেখা গেল। হলদে, লাল, পাটকেলি, এক-একটা জায়গায় একেক-রকম। জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন কেন?"

বন্ধু উত্তর দিলেন, "বাড়ীটা বড্ড সেকেলে' শ্বশুরমশায় করে গেছেন। আমার স্বামীর পছন্দ হচ্ছে না। তাই ইম্‌প্রুভ করার চেষ্টা হচ্ছে।"

পরের বছর দেখলাম বাড়ীটির এক পাশের ঝুলবারান্দা উঠে গেছে, সম্মুখের গাড়ীবারান্দা হয়েছে পোর্টিকোয় রূপান্তরিত।

তার পরের বৎসর, বাড়ীটির ইমপ্রুভমেণ্টের ফলে বাড়ীর নাম্বার খুঁজে মিলিয়ে আমাকে বাড়ীখানা বার করতে হল।

এক ভদ্রমহিলাকে চিনি। প্রথম দেখায় গোলগাল, হাসি-খুসী, বাঙালীবেশধারিণী একজন প্রাণবন্ত নারী বলে প্রতীয়মান তিনি হয়েছিলেন।

কিঞ্চিৎকাল অতিক্রমের পরে তাঁর শাড়ীজামার যুগান্তর দেখলাম। জামা হয়েছে কাঁচুলি, শাড়ী স্বচ্ছ ওড়না।

তারপরে একদা এক প্রাণী আমার দরজায় গাড়ী থেকে নামলেন। আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম, "কাকে ডেকে দেব?"

তিনি অবাক হয়ে বললেন, "ওকি, আমাকে চিনতে পারছেন না?"

ভাল করে তাকিয়ে দেখি উক্ত ভদ্রমহিলা।

"সে মায়ামূরতি কি কহিছে বাণী,
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি,
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।"

চুল কেটে ফেলা তো বটেই, ভুরু-চোখ-ঠোঁট অন্যভাবে আঁকা।

অতি সূক্ষ্ম সছিদ্র হাতকাটা কাঁচুলী ইঞ্চি কয়েক, শাড়ীর আঁচল আর গায়ে থাকছে না।

বুঝলাম বহু ঘষামাজার পরে এমন রূপ দিতে পারা গেছে। পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে ভাবছেন, সমস্তই বাইরের উন্নতি বা অগ্রগতির কথা শুনছি। মানসিক, সাংস্কৃতিক, জাগতিক পর্যায়ের কথা বলা হচ্ছে না কেন?

সে সমস্ত কথা শোনার লোকও যদি থাকে, বলবে কে শুনি?

আমি? যদি ওসব জানতাম বা ঠিকমত বলতে আমি পারতাম তবে এখানে বসে থাকতাম না কি?

না কি আমার লেখাটিও এমনি রাবিশ হত।

—:::***:::—

কলেজ স্ট্রীটের অতীত গৌরবের কথা মনে পড়লে মনে হয় যেন অনেকদিন আগের বর্ণাঢ্য পটচিত্র বিস্তৃত করে দেখছি।

তখন অপরাহ্ণ হতে না হতে বিভিন্ন প্রকাশালয়ে এক বিশিষ্ট ভিড় জমে যেত। সে ভিড়ের রূপ সাহিত্যিক।

বড় বড় প্রকাশালয়ের তখন প্রায়ই ছোট-ছোট দোকান ছিল। কাউণ্টারে বিকেল বেলায় লম্বা সংবাদপত্র বিস্তৃত করা হত। তেলেনুনে মাখা মুড়ি, তেলেভাজা বেগুনীর ছড়াছড়ি। মাটীর ভাঁড়ে চা। বসুধৈব কুটুম্বকম্ তখন।

যাঁরা বই ক্রয়েচ্ছু, অনেক সময় অহেতুক বিলম্ব তাঁদের ব্যসন ছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ব্যগ্র কটাক্ষে দেখে নিতেন কেউ কেউ। সশ্রদ্ধ কৌতুকে অবলোকন করতেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের। এ ওকে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন কে কোনটি কিন্তু আগ্রহ ছিল মূলতঃ শ্রদ্ধান্বিত। অতএব পুলিশ ডাকতে হত না।

যদি অতি নামী ও দামী গ্রন্থ 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' ভাষাভঙ্গি মক্স করার অনুমতি পাই তবে, কলম তুমি লিখে যাও নিম্ন প্রকারে, 'পাঠক-টাঠক' সম্বোধনে :—পাঠক, আপনার কি রবীন্দ্র-নাথের তিরোভাবের পরের যুগ মনে আছে?

বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

আকাশে-বাতাসে উচ্চারিত সাহিত্য-চিন্তা কালের প্রবাহ আচ্ছন্ন করে ভাসমান। সেদিন সাহিত্য জীবনে শ্রেষ্ঠ-বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই যেন তাঁর আসন আরও স্থিরীকৃত হয়ে গেল।

সর্বসাধারণের মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চা দেখা দিল।

সেই দিনগুলির অপূর্ব বিস্ময়, মাদকতা ভোলা যায় না। আমি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পরে এই নেশায় বিহ্বল হয়ে সাহিত্য-চর্চায় গাত্র মেলে দিলাম। অন্য কিছু করার চিন্তাও এল না। 'মাধব, হম পরিণাম নিরাশা।'

ঠিক সেই সময়ে, যুদ্ধোত্তর যুগে কলেজ স্ট্রীটের যে-রূপ দেখা গেছে সে রূপ আজ কোথায়?

পাঠক, তখন জীবনে অনেক অবকাশ ছিল যদিচ অধিকদিন পূর্বের কথা নয়। আমরা অবশ্য আড্ডার যুগটি পুরোপুরি ঠিক

দেখিনি। কিন্তু পরবর্তী যুগেই বা মন্দ কি ?

যাঁদের কাজ ছিল প্রধানতঃ তাঁরাই আসতেন প্রকাশকের কাছে এই যুগে। কোন না কোন প্রয়োজনে আবদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু প্রয়োজনটা মুখ্য হয়ে উঠত না।

এরও পূর্বে যে সকল ঢালাও আড্ডার বর্ণনা আমরা শুনেছি অথবা পূর্বসুরীবৃন্দের স্মৃতিকথায় পাঠ করেছি, সেখানে কর্ম ছিল গৌণ। আমরা শুনেছি বিনা প্রয়োজনে. বা বিনা কারণে, কখনও পদব্রজে পর্যন্ত সাহিত্যিক আড্ডায় লোকে হাজিরা দিত নিত্য। সেখানে যতটুকু জুটত খাদ্যাদি মিলে যেত অবশ্যই। গৃহে নুবোঢ় প্রেমময়ী স্ত্রী সঙ্গ পেতেন না এই সমস্ত অজিলদের। বিনা প্রয়োজনে, বিনা কারণে যত লোক খুসী জুটে যেতেন এই সকল স্থানে। তাঁদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান অন্যত্র, তাঁদের জরুরী কর্ম অন্যত্র হাহাকার করতে থাকলেও তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ, তন্ময়।

না, সুন্দরী কেউ, তরুণী কেউ উপস্থিত থাকতেন না। লেখিকা তখন জনসাধারণের জীব ছিলেন না। সভাক্ষেত্রে কিরণ বর্ষণ করলেও প্রকাশভবনে তাঁরা অদৃশ্য। সোজা বই-এর দোকানে গতায়াত সর্বপ্রথম আমার ভাগ্যেই লেখা ছিল। পরবর্তী যুগের কোন কোন আড্ডায় কদাচিৎ আমাকে দেখাও যেত।

পরবর্তী যুগের আড্ডায় কোন কর্মপ্রয়াসে যুক্ত লোকেরাই প্রকাশকের দোকানে আসতেন। কাজেও আসতেন, অকাজেও আসতেন। কিন্তু কাজ সেরেই চলে যেতেন না।

এযুগে নামকরা লেখক আসেন নামকরা প্রকাশকের কাছে। কাজ সারার সময়টুকু দেন। তারপরেই দ্রুত প্রস্থান করেন।

এ যুগের কলেজ স্ট্রীটে সময় বড় দামী। যে পূর্বের মত অগাধ আলস্যে গা মেলে দিতে পারে, তার মূল্য প্রকাশক খর্ব করে দেখেন হয়তো। কাজ না থাকলেও কাজ আছে, এই ব্যস্ততা-টুকু এ যুগের ভূষণ। শালের মত ঝুলিয়ে সঙ্গে রাখতে হয়।

—আমি খেলো লোক নই, ব্যস্ত, অতি ব্যস্ত লোক ; আমার বাজে আড্ডার সময় নেই। গল্পের সময় নেই। অন্যের সময়ও আমি নষ্ট করব কেন ?

বুঝলেন পাঠক ?

তাছাড়া কলেজ স্ট্রীট অর্থে বিভীষিকা এখন। ট্রাম বন্ধ, বাস বন্ধ, মিছিল, বোমা, আগুন, গুলী, ছোরা. কাঁদুনে গ্যাস। তাই পথটি বন্ধ হওয়ার পূর্বে পিট্‌টান দেওয়া উচিত। নানাদিকে যুগ-পরিবর্তন কলেজ স্ট্রীটকে অভিভূত করে ফেলেছে।

তাই সেই সহৃদয়তার শীতলপাটী পাতা দেখি না কোথাও। ছোট ছোট দোকান ঘুচে বড় বড় দোকান হয়েছে বহু। দোকানের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়ায়, কিন্তু চায়ের আমন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে। কেবলমাত্র কাজ আর কাজ। কোন উৎস কোথায় ধরা যায় ? মাত্র কয়েক ঘণ্টা কলেজ স্ট্রীটের জীবন—দুটো—আড়াইটা থেকে সাতটা—সাড়ে সাতটা। কর্তা ব্যক্তিরা তখনি হাজির। এইটুকু সময়ে যেন এক ছিটেও অপচয় না হয়।

ঘোড়ার রেশ চলছে এখন কলেজ স্ট্রীটে, পাঠক, দেখলেই ধরতে পারবেন। তবে ঘোড়াগুলি অদৃশ্য। ক্ষুরের শব্দ শুধু শোনা যায়, গতিবেগ শুধু বোঝা যায়।

আমি আমার 'বোঝা' গল্পে লিখেছিলাম তরুণ বয়সে :—

'সেই কলেজ স্ট্রীট। প্রতিভার পলাশী প্রাঙ্গণ। কত প্রতিভা জীবিত থাকে, কত প্রতিভার দিনমণি অস্তমিত হল পাঠকের চাওয়া-না-চাওয়ার মানদণ্ডে। প্রতিভা দুশো থেকে আটশো (এখন আঠারোশো) পাতায় বাঁধা পড়ে প্রকাশকের ঝক্‌ঝকে কাউণ্টারে হাহাকার করতে থাকে—

'শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণেক হেসে,
আমার সোনার ধান
কুলেতে এসে"

এইখানে আপাতদৃষ্টিতে নির্লিপ্ত ক্রেতা খোঁজে নিত্য-নূতন আবিষ্কার। সার্কাসের অ্যাক্রোবাটের মত প্রতিমুহূর্তে যে লোক ত দড়ির খেলা দেখাতে পারেন, তাঁর তত জয়। জনমানস চায় মারাত্মক খেলা।

'Slow but steady wins the race—অন্তত কলেজ স্ট্রীটের মটো নয়।'

এখনও কথাগুলো যথাযথ উদ্ধৃতির যোগ্যতা রাখে।

তখনও যা শুনেছি, এখনও রং বদলানো কলেজ স্ট্রীট এক বাক্য উচ্চারণ করে বিপন্ন মুখের মুখোশ মুখখানায় আটকে—'বাজার বড় খারাপ, বড় মন্দ।'

জানিনা আমার অকথ্য কুকথ্য লেখার বংশবৃদ্ধি রোধ করার উদ্দেশ্যে কিংবা যৎসামান্য প্রাপ্তি বিলম্বিত করার অভিলাষে উক্ত বচন!

তবে শুনছি সকল লেখককে আদি যুগ থেকে অদ্যাপি কলেজ-স্ট্রীটেরও ভণিতা শুনতে হয়, তাঁদের পুস্তকের বহুবিধ সংস্করণ হয়ে গেলেও 'ভণিতা' শব্দ আমি refrain অর্থে ব্যবহার করছি। সকল কথার শেষে জোড়া দেওয়ার সুর।

কিন্তু যদি কোন দুর্লভ মুহূর্তে, মুক্তাজন্মের মত বিশেষ নক্ষত্রের নীচে সত্য ঝরে পড়ে, যদি যথার্থই কলেজ স্ট্রীটের এহেন অবস্থা ঘটে থাকে, কারণ কি?

এক কথায় প্রকাশক বলবেন, দেশের বিপর্যয় অবস্থা এবং অর্থনীতির অবনতি।

কিন্তু আমি বলব, লোকের পড়ার অভ্যাস বেড়েছে, কমেনি।

প্রমাণ? প্রত্যহ ইংরাজি পকেটবুকে এবং তদ্বিধ বিদেশী পুস্তকের এক-একটি দোকান বিভিন্ন এলাকায় খোলা হচ্ছে। তাছাড়া, সর্বদিকেই পুরাতন পুস্তকের দোকান আস্তৃত দেখছি।

অবশ্য ইংরেজি পুস্তকে অসাধারণ আস্থার কতকগুলো প্রকট কারণ আছে।

পূর্বে অতি মেধাবী অথবা অর্থশালী না হ'লে বাঙালী এবং ভারতীয়েরা বাইরে যাবার সুযোগ পেতেন না। এখন যে কেউ যে কোন প্রকারে তার টানাটানি বা wire pulling এর দ্বারা বিদেশ যাচ্ছেন। যোগাযোগ প্রচুর হচ্ছে বিদেশী সাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজ বিদায়ের পূর্বে কুহকমন্ত্রের চাষ করে গেল পুরাণোর ডাইনীর নজিরে। ফলে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে বিদেশী ধাঁচের স্কুল, নার্সারি স্কুল মাহাত্ম্য লাভ করল। বাঙালীরা তো ছেলেমেয়ে পাঠালেনই। উপরন্তু অবাঙালীরাও রক্ষণশীলতা বিসর্জন দিয়ে অনেক কিছু করতে লাগলেন। অনিবার্য হয়ে উঠল ইংরেজি স্কুল-কলেজ। তারাও ইংরেজি বই কিনতে আরম্ভ করল।

তাছাড়া, প্রকাশক বাংলা বইয়ের দাম কমাতে পারলেন না। পকেটবই-এর মত সুলভে বহু সংখ্যায় ছাপাতে পারলেন কই? বাংলা বইয়ের রিডিং ম্যাটারও খুবই কম দাম অনুপাতে। এক-ঘেয়েমিপূর্ণ সাহিত্যকমাবর্জিত দামী অথচ স্বল্প সময়গ্রাসী বাংলা বই-এর বাজার টেনে নিল ইংরেজি বই, বিশেষতঃ পকেট-বুক।

আগে ড্রইংরুমে সজ্জিত দেখতাম আনকোরা, মূল্যবান, সুশোভন পুস্তকসঞ্চয়। দেখে মনে হত গৃহসজ্জার অঙ্গ মাত্র, পড়া হয় না। কিন্তু এখন যে-কোন আধুনিক গৃহে দেখা যায় অজস্র পকেটবুক—বেশ মোলায়েম ও থাম্বড্। স্থান সংকটের ক্ষেত্রে স্বল্প জায়গায় বহু বইও রাখা যায়, স্বল্প ব্যয়েও বটে।

তাছাড়া, ধর্মতলা, ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীট পুরাতন বই-এর আড়ৎ। সব বই পাওয়া যায়। গোল পার্ক অঞ্চলেও এখন নিত্য নূতন পুরাণো বই-এর মেলা, পেভমেণ্টে ছড়ানো, দেওয়ালে তাক্ করে রাখা, বাড়ীর রোয়াকে রাখা, দোকান করে রাখা। এদিকে অভিজাত-পন্থী অবাঙালী ও ফিরিঙ্গী স্কুলে পড়া বাঙালী, টীন-এজার কন্যারা হানা দেয়। কিছু পয়সার বিনিময়ে পড়তে নিয়ে যায় (রিডিং)

অথবা পুরাণো বই বদলে নেয় (একসচেঞ্জ) কিম্বা দামাদামি করে কেনে। লেক বাজার থেকে বালিগঞ্জ ষ্টেশন পর্যন্ত পুরাণো বই-এর মেলা। আবার ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে। বেশীর ভাগ তরুণের জনতা।

ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটে প্রধানত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খদ্দের। ধর্মতলায় বনেদী বাঙালী, ফিরিঙ্গী। পাঞ্জাবী, বেহারীরা যখন যেখানে বাসা বাঁধেন সেখানে যান।

কলেজ ষ্ট্রীট হাহাকার করে। ইংরেজি পুরাতন বই এবং নূতন পকেট বুকের পাশে ভিড় জমে।

কলেজ ষ্ট্রীট কি উঁকি দিয়ে কোণের বই-এর স্টলগুলো দেখবেন? তরুণেরা পড়ে কি? পকেটবুক।

রোমান্টিক অসম্ভব কাহিনীগুলো গেলে মেয়েরা, ছেলেরা কেনে ডিটেক্টিভ, খুন খারাপি, অ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি। ইন্‌টেলেকচুয়াল কেনেন আধুনিক রচনা, উপন্যাস, গল্প ভ্রমণ। এ ছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নানা বিচিত্র বিষয়ের বই-এর বিক্রয় সুপ্রচুর। সুলভে মুদ্রিত ক্ল্যাসিক্‌গুলো ঘরে ঘরে দেখি।

লাইব্রেরী নির্ভর, ব্যক্তিক্রেতার সন্দিহান কলেজ ষ্ট্রীটের ভেবে দেখার দিন এসে গেছে।

পাঠক, আপনি কি বলেন?

—:::***:::—

যুগ যন্ত্রণা

ভাই ঘুম ভেঙে উঠে আমার বুক ধড়ফড় করে। মনে হয় একটা কিছু ঘটবে বুঝি এখনই।

এহেন সময়ে যদি টেলিফোন বাজে, আমি আর নেই। কপালে ঘাম ফুটে ওঠে, বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। আমি কেমন যেন হয়ে যাই। আমার ঘরের সঙ্গে লাগানো টেলিফোন হ'লেও অন্য লোকের ছুটে এসে ধরতে হয়।

গভীর রাত্রে টেলিফোন যদি বাজে? ওরে বাবা! আমি নড়তে পারিনে, স্থাণু হয়ে যাই। বাড়ীর অন্য লোকে ধরে তো ধরুক। আমি নাচার।

আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে কখনও 'ন্যাকা' বলে থাকেন, স্বীকার পাচ্ছি। কিন্তু সকলে কি একই প্যাটার্ণে গড়া হয় না কি? না কি সকলে একই ভাবে চলে ফেরে? ব্যতিক্রম হলেই ন্যাকা? প্রতিভাও তো হতে পারে।

যাকগে, এঁদের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। অযথা সময় নষ্ট। বরঞ্চ ভুলে গেলেই মনে শান্তি পাব।

রাস্তায় চলা আমার পক্ষে দায়। আমি ভাই, মোটে রাস্তা পেরোতে পারিনে। রাস্তায় পা দিলেই মনে হয় যত গাড়ী বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে।

দাদারা বলেন, "নিজেকে এত মূল্যবান ভাবো কেন? পৃথিবীর সকলের চক্রান্ত তোমাকে নাশ করার জন্যে না?"

তা বললে চলে না। যার-যার মূল্য তার কাছে ঠিক আছে, ঠিকই আছে।

আমি রাস্তায় তাই ঠেলে উঠি পেভ্‌মেণ্টে। যদি না থাকে, তবে রাস্তার নিরাপদ ভিতর দিকে নিজে থেকে, অন্য লোককে বাইরের দিকে দিয়ে দেই। কি করব? সকলের নার্ভ তো আমার মত ভঙ্গুর নয়।

ভয়াবহ কিছু না হলে লোকের ভয় হয় না, এ কথা মিথ্যা। ভয় একটা অভ্যাস। ভয় পেতে আরম্ভ করলে সবটাতেই ভয় হয়। মেরুদণ্ড সুদ্ধ বেঁকে যেতে পারে। আমাকে ছেলেবেলায় ভয় দেখানো হত প্রচুর, নানা কারণে ও অকারণে। অতএব আমি ভীতু হয়েছি। এজন্য মাতাপিতাকে দোষ দাও। আমাকে 'ন্যাকা' বলা চলে না। যারা ন্যাকা—বোবা—হাবা দেখতে হয় শয়তান। আমি ভাল মানুষ। ছেলেবেলা থেকে আমি কিছু নয় শুনতে শুনতে আমার 'হীনমন্যতা' দোষ হয়ে গেছে।

হবেই বা না কেন?

কুকুর-বিড়ালগুলোও আমাকে গ্রাহ্য করে না। আমি তাড়া দিলে তাড়া খায় না। রুখে আসে।

দুঃখের কথা বলব কি ভাই? অবশ্য শুনলে শেষ পর্যন্ত তোমরা এটা 'সুখের কথাই' বলবে নিশ্চয়।

হাজারীবাগ রোডে হাওয়া বদলে গেছি। বুনো জায়গা বলে বিখ্যাত সে স্থান, সকলেই জানে।

একদিন একখানা লাল শাড়ী পরে বার হয়েছি পথে। বনের

মাঝ দিয়ে কাটা মাটির পথে সকালবেলার রোদে।

হঠাৎ থমকে গেলাম। পথের মাঝখান দিয়ে পার হচ্ছে এক ফণাতোলা সাপ। আমি তারি সম্মুখে।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। সে-ও দাঁড়াল। এক মিনিট নাটকীয় পরিস্থিতি।

তার পরেই সে নির্বিবাদে চলে গেল। মনে হ'ল আমাকে গ্রাহ্য করার যোগ্য ভাবেনি।

আমার শুভার্থীবৃন্দ শুনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেন, "লাল শাড়ী পরা ছিল বলে—রোদ ছিল বলে—বড় বাঁচা বেঁচে গেছ।"

আমি ভাবলাম ওটা সর্পের দয়া, না তাচ্ছিল্য? পরে একদিন পড়ে গেলাম ক্ষ্যাপা কুকুরের সামনে। তেড়ে এসেই গেল ধেয়ে অন্যদিকে একটা বোলতার দিকে।

মানুষের কথা আর কি বলব?

রিক্সাওয়ালা বলে, "আপনি বলেই কম পয়সা নিচ্ছি দিদি, অন্যে হ'লে বেশী নিতাম অনেক।"

'অন্য' মানে যোগ্যতর। হা হতোস্মি! বাড়ী যেন কারাগার। বাইরেও কেউ মানে না। গোলমুখ দেখে হাবা ভাবে। জামা কাপড়ের চটক নেই দেখে ভাবে সাজতে জানে না।

পিয়ন এসে বলে, "সই দিতে হবে ইংরেজিতে। পারবেন তো?"

আয়নায় তাকাই নিজের মুখে। কালিঝুলিমাখা একখানা শ্রমিকের মুখ। লোকে মানবে কেন?

লোকে কি দেখে মানে?

ঝ্‌কঝকে হাসি, চক্‌চকে পোষাক। তাই বুঝি দাঁতের মাজনের এত বিজ্ঞাপন?

পোষাক ভাল না হলে লোকে আজকাল মানে না। অথচ বাড়ী বসে কলমপেষার কাজ করার জন্য সুন্দর পোষাক পরার অর্থ নেই। অনেক বিলিতি লেখক নাকি রীতিমত সাজ-পোষাক

করে একা ঘরে লিখতে বসেন বলে শুনেছি।

আমি ওসব বিশ্বাস করি না মোটে। কিন্তু কই, মহাত্মা গান্ধীর কটীবাস ধারণে সাহস পাই না?

তবে আমরা কোন প্রকার বস্তু?

আমরা পুরোপুরি কোনও কিছু নয়। আমরা কেবল সময়ের দাস। সময় অনুযায়ী কথা বল, সময় অনুযায়ী পোষাক কর, তবেই তুমি হীনমন্যতা রোগে ভুগবে না। আমার আইডেন্টিটি কার্ড নেই। আমি সকলের মতই। আমাকে আলাদা দেখ না, আলাদা রেখ না।

আমি ভীরু, আমার মৌলিকত্ব দেখাবার সাহস কোথায়? অরিজিন্যালিটি চেপে মিছিলে মিশে যাও।

আমার নার্ভ খারাপ। সুতরাং স্পষ্ট কথা বোল না। যদি কলহ বাধে, যদি শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়? ওরে বাবা, নার্ভে লাগবে যে। সুতরাং অন্যায় দেখে চেপে যাও, ভাই।

আমার হীনমন্যতা রোগ। সুতরাং ধার করে দামী পোষাক কিনে পরে বেড়াও ময়ূরপেখমের প্রথায়। লোকে চেয়ে দেখবে, বড়লোকের চাকর সমীহ করবে। দশজনে যেমন জামাকাপড় পরে কিনে নাও, ভাই। কিনে পরো। নিজের পছন্দকে, সাবধান, মাথা তুলতে দিও না। লোকে গ্রাহ্য করুক এটাই যদি চাও, নিজের মত হোয়ো না, ভাই, কক্ষণও নিজের মত হোয়ো না।

ভূত, কিম্ভূত, অদ্ভুত, প্রেত, প্রেতাত্মা, এবম্বিধ কথাগুলি আমি শুনেছি গালাগালির প্রসঙ্গে।

তাহলে আভিধানিক অর্থে ভূতের যে-কোন ব্যাখ্যাই হোক, 'প্রাণী' অর্থে (যথা সর্বভূতে প্রীতি) বাক্যটি নয় ব্যবহৃত। উক্ত ক্ষেত্রে ভূত অশুভ আত্মা, কিনা (spirit) স্পিরিট, ভূতযোনি। ভূতযোনি অর্থাৎ যে পদার্থ, (আর কি বলতে পারি, বলুন) ভূত হয়ে জন্মায়। মানুষ মরে ভূত হয় না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে বলেছেন 'ভূত মরে মার্বেল হয়,' সেটাও অসত্য। ভূত এক অজয়, অমর, ভীতিপ্রদ অজানা পদার্থ।

ভূত যে বীভৎস এটা সার্বজনীন সত্য বলে গৃহীত। অতএব বীভৎস কিছু বোঝাতে লোকে 'ভূত' বলে গালি দেয়। 'ভূতে ধরেছে' বললে বোঝায় ভয়াবহ খারাপ আচরণকে। কিন্তু ভূত বীভৎস কেমন করে জানা গেল শুনি? বলি, ভূতকে কেউ দেখেছেন না কি? অথচ বই বা চিত্রে ভূতের মারাত্মক বর্ণনা পড়ে এবং দেখে বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে মরি আর কি!

এখানে জনান্তিকে একটা কথা বলি। আজ বর্ষার ঘন মেঘের অন্ধকার কেটে যেয়ে সূর্য উঠেছে দেখেই আমি প্রভাতে ভূততত্ত্ব লিখতে বসেছি। সারা দিন না খেয়ে, না স্নান করেও দরকার

হলে সন্ধ্যার আগে আমাকে শেষ করতে হবে, কারণ নইলে ওই যা বললাম, ভয়েই প্রাণ যাবে।

ভূতে যদি এত ভয় তবে লিখি কেন ভূতকে নিয়ে? জ্বালা তো ওখানেই। যেখানে ভীতি সেখানেই আকর্ষণ প্রচণ্ড থাকে, মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন।

যাই হোক, আমি বলছি কি, যদি রুবেন্সের দেবদূতের মত বা বত্তেচেলির শিশুর মত কোঁকড়া চুল, হরিণনয়ন ও অপার্থিব লাবণ্য মেখে এক ছবি এঁকে বলি 'এই ভূত!'

কে আমাকে প্রতিবাদ জানায়?

এমন যদি না হয় তবে কেমন? প্রমাণ কি দিতে পারেন? ওই যে 'কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত,' শিশুপাঠ্য ভূত, সেই সত্য না কি? আর, আমার ভূত মিথ্যা?

কোথায় দেখেছেন ভূত, বলুন।

কেমন দেখেছেন ভূত, জানান।

কবিশেখর কালিদাস রায়মহাশয় অসুস্থতা হেতু গৃহবদ্ধ থাকলেও রসভাণ্ডার শেষ করে ফেলেন নি।

তিনি সহাস্যে একদিন বলেছিলেন, 'ও বাণী, সে-সব ভূত গেল কোথায়? গাছে গাছে, ডালে ডালে ভূত ছিল আগে, এখন তারা অদৃশ্য হল যে!'

ঠিক কথা, ভেবে দেখলাম। আগে গাছ দেখলেই লোকে ধরে নিত ডালে পা রেখে শাঁকচুন্নী বসে আছে। অশ্বত্থ-বট-শ্যাওড়া হলে রক্ষা নেই। ব্রহ্মদৈত্য, স্কন্ধকাটা, মামদো, কে না আছেন। পাড়াগাঁয়ে 'সন্ধ্যার পর সাবধান।' এখনি সাঁ-সাঁ করে উড়ে যাবে প্রেতের সারি! খড়ম পরে খটাং-খটাং শব্দে হাঁটবে পৈতাগলায় ব্রহ্মদৈত্য। বেঁড়েভূত, হেঁড়েভূত, মেছোভূতের ভয়ে কণ্টকিত পল্লীবাসী এলোচুলে গাছের তলায় যেত না, কাপড়ের আঁচল উড়তে দিত না। মাছ হাতে অন্ধকারে একা

হাঁটত না। অন্তঃসত্ত্বা খোঁপায় কুটো গুঁজে বার হত ঘরের।

সমস্তই অপদেবতার হাত থেকে আত্মরক্ষার্থ। গারসী-ব্রতে ভোরের আলোর ছোঁয়ার আগে কুলো পেটা-পেটি করে কানাচ থেকে বিতাড়িত করা হত প্রেতশাবকদের।

যখন তখন ধড়াস্-ধড়াস্ করে লোকে পড়ে যেত, ভূতে ধরত তাদের। রোজার অমানুষিক প্রহারে 'বাপরে-মারে' বলে ভূত পালাত।

এখন প্রাগৈতিহাসিক সেই দিনগুলির সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখন গাছ নিছক গাছ, ভূতের ভবন নয়।

ও-সব ভূতের বর্ণনা নানা কাব্যে, মহাকাব্যে পাই। দান্তে হোমার, মধুসূদন নরকবর্ণনায় কত বলেছেন। হেমচন্দ্রে, দক্ষযজ্ঞ-বিনাশে স্বয়ং ভূতনাথের ভূতপ্রেত সহতাণ্ডব পড়ে চোখের ঘুম উড়ে যায় রাত্রে। বিশ্বাস করেছেন বা না করেছেন, উক্ত লেখকেরা সতীনাথ ভাদুড়ীর ভাষায় 'কলমতোড়' লেখা লিখেছেন।

আবার অন্য ধরনের ভূত যেন মানুষ। বিগত পরিজন, বন্ধুর মূর্তি ধরে ছায়ামূর্তি যখন তখন দাঁড়ায়। যাঁরা পরলোকতত্ত্ব এবং প্লানচেট করে থাকেন তাঁদের ধারণা এই। কিন্তু হায়, যে-দর্শক এই দুর্লভ দর্শনের অধিকারী হয়ে থাকেন, মৃত প্রিয়জনকে দেখে তাঁর আহ্লাদ হয় না, নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম ঘটে।

পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম প্রাণের উপাদান বলে কীর্তিত পাঁচ ভূত।

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' পুস্তকের পরিচয়ে লিখেছেন—'ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষকে অবিকল মিলাইব কি করিয়া। আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আর আদালতে উপস্থিত হইতেছি না।'

রবীন্দ্রনাথ এতই বৃহৎ ও মহৎ যে কোন কারণেই তাঁকে পাঠকেরা আদালতে দাঁড় করাবার কথা ভ্রমেও মনে আনতে

পারে নি। তিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা', 'দুঃস্বপ্ন' প্রভৃতি বিখ্যাত ভৌতিক গল্প লিখেছেন। সেগুলি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কারুর মনে জাগে নি।

কিন্তু আমি চুণোপুঁটি, আমি যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি একটি নিবন্ধ লিখছি, এমন বিষয়ে যে বিষয় আমি জানি না। সত্যাসত্য জানা নেই আমার। সম্পূর্ণ হাইপথেসিস্-এর (Hypothesis) ওপরে ভিত্তিমূলক এই রচনা। তবে সাহস আছে মনে, কারণ এমন পদার্থ নিয়ে যাঁরাই গবেষণা করবেন, সকলেরি আমারি দশা। প্রতিপাদ্য ধরে নিয়ে তবে অগ্রসর হওয়া চলবে।

কেউ কেউ হয়তো ভূত দেখেছেন, অশরীরী উপস্থিতির সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আমি তাহলে আমার এক বন্ধুর উক্তি স্মরণ করে বলব, আপেক্ষিক সেই অভিজ্ঞতা।

কথাটা ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিন। অধ্যাপক কথাচ্ছলে একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন," well, P.—, have you seen a ghost ?" ওহে প—তুমি কি ভূত দেখেছ ?

ছাত্রটি সপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "It depends".

সেটা নির্ভর করছে—

অধ্যাপক বিস্মিত,

"How is that ? You must say yes or no. It depends on what ?"

সে কি কথা। তুমি হ্যাঁ কি না বলবে। কিসের ওপর সেটা নির্ভর করছে, শুনি ?

ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে দিল।

"It depends whether it is a ghost or not,sir"

স্যার, সেটা সত্যই ভূত কি ভূত নয়, তারি ওপরে আমার ভূত দেখাটা নির্ভর করছে।

উচ্চ হাস্যরোলে আমিও যোগ দিয়ে কাশির ধমকে বিব্রত হলাম। পেছন থেকে চাপা গলায় আর একটি সহপাঠী স্বতঃপ্রবৃত্ত উপদেশ দিল, "পেপ্‌স (Peps)."

সেই দিন চরম জ্ঞান লাভ করেছিলাম। যাঁরা ভূত দেখেছেন বলে বড়াই করেন, তাঁরা ভেবে দেখবেন কথাটা।

আগে মনে হত ভূত যদি অদৃশ্য পদার্থ, তাহলে ডানলো-পিলোর গদি বা সেকালের মখ্‌মলের জাজিম, সুরম্য অট্টালিকায় না থেকে গাছের ডালে বসবে কেন ?

পরে বুঝেছিলাম, প্রাণ-পাখী দেহখাঁচায় আবদ্ধ, ছাড়া পেলে সে মুক্ত পাখী, ইত্যাদি নানা দেহতত্ত্বসঙ্গীত প্রচারের ফলে আত্মাকে ভূত বলে ধরে নিলে সে তো গাছের ডালেই বসবে।

প্রেতাত্মার সংসারে কাজকর্ম নেই নিশ্চয়, কারণ সে তো বায়ুভুক বায়বীয় সত্তা। সর্বদা মনুষ্যের খুঁৎ ধরে তার ক্ষতিসাধন একমাত্র কাজ তার।

আবার সদ্ভূতের কাজ সাহায্য করা, রোগের ওষধি, গুপ্তধন বাৎলে দেওয়া, বিপদে সতর্ক করা।

ভূত অতিশয় পরিহাসপ্রিয়। অধিকাংশ ভৌতিক আখ্যানেই 'হাঃ-হাঃ' হাসি তার শোনা যায়। অত হাস্যরোলের কি আছে বুঝি না। ওদের জীবন তো বিশেষ সুখের বলে মনে হয় না।

ভূতের অন্য অর্থও আছে। আমি সেই অর্থে এক ভূত দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মত ভীতু ব্যক্তিও বিন্দুমাত্র ভয় পায় নি। জলজ্যান্ত চোখের সামনে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম মাত্র। আমার নিজেরই কৈশোরকালে নিজের বাড়ীতে কোনও উৎসব উপলক্ষে লোকজন, খাওয়া-দাওয়ার প্রাদুর্ভাব একদা ঘটেছিল।

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক বহুদিন যাবৎ পরিবারের বন্ধু, তিনি খাওয়া-দাওয়া তদারক করছিলেন। আমাদের কুটুম্ব একটি অতি সুপুরুষ তরুণ পরিবেশনে ব্যস্ত।

তরুণটির সঙ্গে কৈশোরসুলভ চাপল্যে আমরা রঙ্গ-পরিহাস করছিলাম। আমি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম বোধহয়।

হঠাৎ ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তাকিয়ে দেখি মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি আমাদের জটলায় এসে পড়েছেন।

আমি অপ্রতিভ হয়েছি দেখে তিনি কেবলমাত্র আমার শ্রবণ-গ্রাহ্য স্বরে বললেন, "অপ্রতিভ হচ্ছ কেন তুমি? আমি তো ভূত। আমি তো ভূত মাত্র।"

আমি ভাবলাম ভদ্রতার খাতিরে প্রতিবাদ সমীচীন, তাই বল্লাম, "না না, সে কি? আপনি কেন ভূত হতে যাবেন? আপনার এমন আর কি বয়স হয়েছে।"

গভীর ক্ষেদের সঙ্গে সেই প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—যাঁর রগের পাশে চুলে শাদাতার চিকমিকিয়ে উঠছে, যাঁর পুত্র-কন্যা আরামে বড় হচ্ছে, যাঁর ঘরে খাণ্ডার স্ত্রী—"আমি ভূত মানে অতীত, তোমার অতীত।"

উক্ত চাঞ্চল্যকর ও সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত তথ্যটি পরিবেশন করার পর দ্বিতীয় তথ্য তিনি জানালেন তেমনি চমকপ্রদভাবে। সুদর্শন তরুণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে দিলেন। "এই তোমার বর্তমান। বর্তমানের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই।"

আমি একখানা চিংড়ির কাটলেট হাতিয়ে মুখে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলাম, কথার আঘাতে ধপাস্ করে মুখ থেকে মাটিতে পড়ে বরবাদ হল।

আমার বাবার বয়সী এই ব্যক্তির সঙ্গে জীবনে পনেরো মিনিটও নিভৃত আলাপ হয়েছে কি-না সন্দেহ। অনায়াসে তিনি আমার ভূত হয়ে গেলেন !!

আর এই কাট্‌লেট—প্রদানকারী পরিবেশনরত তরুণের তো আমাকে আর আমার বন্ধুদের দু'এক প্রস্থ খাদ্য গোপনে সাপ্লাই করা ভিন্ন কোন অবদান নেই !!

তিনি হলেন বর্তমান ? খাদ্যের বর্তমান নয়, সমগ্র বর্তমান।

হতবাক অবস্থায় স্থান ত্যাগ করে দুর্জনকে পরিত্যাগ করলাম।

কিন্তু না, লেখাটা শেষ করতে পারলাম না। গভীর রাত্রি নেমে আসছে। এখন আমি অন্য লোক হয়ে যাই। নানা যুক্তিতর্ক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মনে বল পাই না ভূত বিষয়ে সামান্যতমও আলোচনা চালাবার।

মনে পড়ে যায় হ্যাম্‌লেটের অমর উক্তি, পিতার প্রেত দেখার পরে সন্দিগ্ধ বন্ধুসকাশে।

"There are some more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your philosophy"—

হোরেশিও, আকাশে পৃথিবীতে তোমার জ্ঞানের সুদূরতম স্বপ্নের বাইরেও অনেক বস্তু আছে।

অতএব আমি পদ্মআঁখি রঘুবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে লেখা বন্ধ করি।

—:::**:::—

আজ আমার জন্মভূমি জ্বলছে। চক্রাকারের পরিভ্রমণে বক্রতা দেখাতে পারছি না এখন। এখানেই আটকে গেছি। আমি আজ এখানে আটকে গেছি।

পূর্ব বাংলা আজ স্বাধীন দেশ। গর্বে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আবার সোনার বাংলার শ্মশানরূপের সংবাদে চোখে জল আসে। হর্ষ-পুলকের ঘাতপ্রতিঘাতে সারা মন যখন উদ্বেল তখন কি আর বলি?

পোড়ামাটি-নীতির অনুসরণ করে নৃশংস পশুশক্তি সর্বত্র আগুন জ্বালিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে। সেই সব সোনার দেশ জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যে এই আগুন শেষ পর্যন্ত জল্লাদদেরকেই জ্বালিয়ে মারবে। নূতন বাংলাদেশ আবার মাথা তুলে নব-উদ্দীপনায় জেগে উঠবে। স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্বয়ং হিটলারও বোধহয় পিণ্ডির শাসকচক্রের কার্যকলাপ দেখলে গুহা নিহিত বৃক্কারের উদ্যানের কম্বলঢাকা ধ্বংসাবশেষ থেকে মাথা তুলে নড়-চড়ে বসতেন। ইহুদীহনন, গ্যাসচেম্বার এই অত্যাচারের কাছে কোথায় লাগে? অজেয় ফুরর আক্ষেপ করতেন: পাকিস্থানী পশ্চিমা সামরিক সরকারের কাছ থেকে

নৃশংসতা তিনিও লিখতে তো পারতেন। ভাবতেন: হায়, হায়, এত সব নিষ্ঠুর পদ্ধতি আমিও প্রয়োগ করতে পারিনি! এটা হয়নি, ওটা হয়নি!

হের হিটলার তাঁর তৃতীয় রাইখের স্বপ্ন একশো আশী লিটার পেট্রল ঢেলে পুড়িয়েছিলেন। ইয়াইয়া খান, ভুট্টোর পুড়ে মরতে অতটাও লাগবে না।

আজ মনে পড়ে আমার দেশ পূর্ববাংলার ছবি। শৈশবে তারুণ্যে সেখানে আনন্দ সঞ্চয় লাভ করেছি। স্বপ্ন দেখেছি প্রকৃতির রূপে বিহ্বল চক্ষে। অনুপ্রেরণা এসেছে কবিতার, সাহিত্য-সৃজনের। সেখানে গাছের পাতা এত সবুজ, এত মসৃণ ছিল যে, যেন স্নেহপদার্থ ক্ষরিত হত। সে দেশ পাবনা জেলা।

পুরনো দিনে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ বুঝতাম না। মুসলমান মিয়াজান দুধ দুইয়ে আনত। কাঁধে করে সারা বাড়ী ঘুরিয়ে আনার আবদার হাসিমুখে রাখত আর "পিতামহীর" কাছে নালিশ করত, কওচেন, কাম করবের দিতেছে না। কাদের নৌকা বেয়ে বেড়াতে নিয়ে যেত খালবিলে। বর্দ্ধিষ্ণু শেখসাহেব বাইরের ঘরে বসে চা খেতেন। তাঁরা সকলে আজ কোথায়? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাতিভেদের পার্থক্য ছিল সত্য কিন্তু অন্য জাতের মধ্যেও তো ছিল। ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ-বৈদ্যের সঙ্গে শ্রেণী-বিভাগে তৎপর ছিলেন। কায়স্থ বৈদ্যেরা আবার সা-শুঁড়ী দেখে নাক সিঁটকাতেন।

তবু অখণ্ড বাংলার রূপ পূর্বে তখনি দেখেছিলাম। আজ ধর্মান্ধতার দিন শেষ হয়ে গেছে। ধর্ম যে কোন দৃঢ় বন্ধন আর নয়, সেকথা ওপার বাংলার লোকেরা বুঝেছেন। ভাষা ও জাতি যে বর্তমানের সর্বাপেক্ষা দৃঢ়গ্রন্থী একথার পূর্ণ উপলব্ধি রক্তের ধারায় স্নান করে তবেই আমাদের শিখতে হল।

অতঃপর শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশীত্ব ও মৈত্রীর পথে কোনও কণ্টক থাকবে না। আচার-বিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লৌকিক ধর্মের নিষেধের প্রাচীর আমরা হিন্দুধর্মে ভূমিসাৎ করে দিয়েছি। মুসলমান ধর্মেও অনুরূপ প্রতিফলন।

আমাদের দেশ বিরাট ভূখণ্ড। যথাযোগ্য শ্রম ও উদ্যমে এদেশে সোনা ফলানো যায়। অতএব সোনার বাংলার একছিটে ভূমিখণ্ড গ্রাসের ইচ্ছাও ভারতবর্ষের নেই। মানবিকতার আবেদনে চিরকালই ভারতবর্ষ সাড়া দিয়েছে।

সহসা জনপ্রিয় নেতাদের পশুশক্তির আক্রমণে নির্বিচার হত্যায় নিঃশেষ করবার নির্মমতা দেখে আমরা হতবাক। শোষিতের প্রতি শোষকের অত্যাচার। যে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখেছিলাম, সেই পৃথিবীর এইরূপ হতাশায় হৃদয়কে মথিত করে তোলে। কোথাও আদর্শ নেই, ন্যায় নেই, দয়া নেই। কিন্তু আবার সেই আদর্শের সাক্ষাৎ মেলে সীমান্তের ওপারে। নিরস্ত্র মানুষ যেখানে সর্বস্ব পণ রেখে জীবনমরণকে তুচ্ছ করে লড়াই করেছে স্বাধীনতার জন্য, আদর্শের জন্য। দুর্ধর্ষ জঙ্গী বাহিনীর ট্যাঙ্ক, বিমান, কামানের মুখে দাঁড়িয়েছে নিরস্ত্র বাঙালী। নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, জলবাহিনী—সমস্ত যেন গোটা রাশিয়াকে বা আমেরিকা মহাদেশকে জয় করতে চলেছে নির্লজ্জ ঘাতকের দল। প্রতিটি প্রাণ তবুও সংগ্রামে অবিচলিত, নির্ভীক।

আর আদর্শ দেখছি এপার বাংলার সমবেদনা ও সহানুভূতির মধ্যে। সরকারের অনেক আগে এগিয়ে এসেছেন জনগণ। ত্রাণকার্যে অকুণ্ঠ দান করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে সোচ্চার দাবী জানিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলার স্ত্রী-সমাজে আজ সুদিন আর নেই। মন্ত্রিসভায় একজন নারীও স্থান পান নি। সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আর তাঁরা পুরোধা নন, অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। কেন জানি না।

ত্রাণকার্যে কিন্তু মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে এসেছেন। কোনও জবরদস্ত কমিটির মধ্যে তাঁদের নাম না দেখলেও প্রতিটি গৃহে তাঁরা সজাগ বেদনায় সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন। আমাদের ছোট 'লেখিকা' গোষ্ঠীর কাজ আরম্ভ হয় বহুপূর্বে ৩১শে মার্চ তারিখ থেকে। ১লা এপ্রিল 'যুগান্তরে' লেখিকার পক্ষে আমি ছোট একটি আবেদন দিয়ে আশাতীত ফল পেলাম। অর্থ সংগ্রহ বেশীর ভাগ ঘুরে ঘুরে করলেও মাণিঅর্ডারে, খামে ভরে টাকা এসেছিল। টেলিফোনে যোগ করে খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার যার যা সাধ্য, হয় পাঠিয়েছেন, নয় আমাদের নিয়ে আসতে বলেছেন। এক মহিলা এক থলে চিঁড়ে পাঠালেন, "আহা, ওরা রাঁধবার সময় পাবে না। ভিজিয়ে খাবে।" একদল বালিকা জামা-কাপড়ের প্যাকেট আনল। সীমান্তে যথাযোগ্য স্থানে পৌঁছবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছে। কিন্তু তেমন তেমন আশু প্রয়োজনীয় নয় এমন বস্তুও আমরা ফেরৎ দিইনি। সশ্রদ্ধায় অতিকষ্টে পৌঁছে দিয়েছি। দিয়েই তাঁরা ধন্য, গ্রহণ করলেই তাঁরা কৃতার্থ।

স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁরা দিতে চেয়েছিলেন—প্রত্যেকে। একদিনের বাজারের খরচ বাঁচিয়ে গৃহিণীরা দান করেছেন সাগ্রহে। পাড়ায় পাড়ায় অর্থ সংগ্রহ করেছেন মেয়েরা। রেডিও, সংবাদপত্র খুলে উৎকণ্ঠ মমতায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

'লেখিকার' পক্ষে আমরা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, লেখিকা, শিক্ষাব্রতী মহিলাদের সইসহ ব্যাপক গণহত্যা ও নারীনির্যাতন বন্ধ করবার ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আবেদন প্রচার করেছি ইতিমধ্যে, রোশেনারা বেগমের আত্মত্যাগের সংবাদ পাওয়া মাত্র।

৭ই এপ্রিল মহিলাদের আয়োজিত একটি সভায় আমরা পূর্ব বাংলার কবিদের অনেকগুলি কবিতা পাঠ করেছি। এছাড়া বিশেষ পোষ্টার আঁকবার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের অক্ষম চেষ্টা ছাড়া

সারা দেশে অসংখ্য মহিলাসংস্থা অর্থ-সংগ্রহ, সাহায্য প্রেরণ, মৌন পদযাত্রা, প্রতিবাদ-সভা ইত্যাদি বহুবিধ কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। মুজিব রহমানের জয় তাঁদেরি জয়। তাঁরাও আশায় শঙ্কায় দোলায়মান ছিলেন।

আমরা এপার বাংলার মেয়েরা কি চাই? প্রতিদান? চাই ওপার বাংলা নতুন স্বাধীন জীবনে বেঁচে উঠুক, ওদেশের মেয়েরা নিঃশঙ্কায় নারীত্বের মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। যে দেশ আমরা ছেড়ে এসেছি তার সূচীপ্রমাণ ভূমিতে আমাদের তিল প্রমাণ লোভ নেই।

আমরা শুধু চাই আমাদের সেই গৃহগুলিতে প্রতি সন্ধ্যায় সহর্ষ প্রদীপ জ্বলুক।

আমরা শুধু চাই, যে ফুলগাছটি আমার পিতামহী পূজার উদ্দেশে রোপণ করেছেন, সেই গাছটির ফুল ওঁদের মেয়েরা চুলে পরুন।

'ফুলের যা দিলে হবে নাকো ক্ষতি। অথচ আমার লাভ—'

—এটুকুই শুধু আমরা ওপার থেকে চাই।

—:::***:::—

দেহের শেষ রক্তবিন্দু

কাগজে পাক-বর্বরতার উদাহরণ পড়েছি : সুস্থ যুবককে ধরে জোর করে দেহের শেষবিন্দু রক্ত শোষণ করে নেওয়া। সেই রক্ত পাঠানের রক্তহীন দেহে প্রবিষ্ট করে তাকে চাঙ্গা করা।

সত্য কি মিথ্যা খবর জানিনা। কিন্তু খানদের চিন্তা যে বিভ্রান্তিকর, সন্দেহ নেই। যে জাতিকে ঘৃণা করে লুপ্তির পথে ঠেলা হচ্ছে, সেই ন্যাক্কারজনক বাঙালীরক্ত খানদেহকে কি বাঙালী করে তুলছে না?

তবে কি হবে?

যাইহোক, বাকচাতুর্যে স্বীয় নামের জাষ্টিফিকেশনের চেষ্টা ছেড়ে ভাবনা-চিন্তায় নামি।

দেহের শেষ রক্তবিন্দু শোষণ করে নেয় কে?

কারা?

জন্তু-জানোয়ার তো বটেই! সুন্দরবনের হালুমের কথা প্রথমেই মনে হচ্ছে, না? ওরে বাবা!

কিন্তু একটা এক ইঞ্চি জন্তুরই-বা ক্ষমতা কম কি? জোঁক! নুন দিয়ে ছাড়াবার আগেই আধাআধি রক্ত সাফ। ওহো-হো!

সর্প দংশন করলে রক্ত শুষে না নিলেও বিষপ্রবাহে রক্ত-প্রবাহকে নীল করে দেয়। হোয়াইট ক্যানসারে শরীরে লাল

রক্তকণিকা ক্রমে শাদা হয়ে ওঠে। সে-ও শোষণ। রাজযক্ষাকে নমস্কার করি। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কঠিন অজীর্ণ, নানাবিধ অসুখে রক্ত অল্প হয়ে যায়। অসুখের কথা বলা যায় না। অতীন্দ্রিয় লোকের বস্তু। কারণ, কার্যকারণ থাকলেই অসুখ হয় না। জলে ভিজে কখনও সর্দিজ্বর হয় না, আবার একটু ভিজে কাপড়ে থাকলেই হয়ে গেল। এক লিকলিকে রোগা বেশ বেড়াচ্ছে, যোয়ান ধরাশায়ী রোগে। না খেয়ে কিছু হল না, ধনীগৃহে ক্ষয়রোগ।

এছাড়া ভাইরাসের কথা বলা শক্ত। প্রায় দৈবঘটিত রোগ।

রক্তাল্পতায় মৃত্যু, আবার অধিকেও তাই। রক্তচাপের রোগীর বিষয়ে ধরুন না। দেহের বাড়তি রক্ত বার করে না ফেললে গেলেন তক্ষুণি।

এক উচ্চ পর্যায়ের মহিলাকে চিনি। স্বামীর কর্মক্ষেত্রে ডোনেশান তোলা হচ্ছে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হেতু, তিনি অর্থ না দিয়ে রক্ত দান করলেন।

হয়তো অর্থের থেকে রক্তের মূল্য ওঁর কাছে কম। কিম্বা রক্তচাপ ?

চটে যাবেন ভয়ে জিজ্ঞাসার সাহস পাইনি। শরীররক্ষায় রক্তের গুরুত্ব মেনে নিলাম। এক্ষেত্রে দৈবজনিত কারক ভিন্ন জাগতিক রক্তশোষার দলকেই পরীক্ষা করি।

হ্যাঁ, এই সূত্রে একটা অত্যুক্তির কথা বলে নিই। দেহের শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা বা কারুর সম্মান রাখার কথা বলা হয়ে থাকে।

বীরসৈন্য যখন যুদ্ধে প্রাণ দেন তখনও তাঁর দেহ থেকে সর্ববিন্দু রক্ত বেরিয়ে যায় না, কিছু থাকে। আততায়ীর হনন কার্যের পরেও কিছু থাকে। অতএব দেহের শেষবিন্দু রক্ত দিয়ে কিছু করাটা বলা নিছক অত্যুক্তি।

মানুষ শোষক হয়। রক্তপায়ী মানুষের বহু উদাহরণ আছে।

নানা গল্পগাথায় লোমহর্ষক বর্ণনা লেখা হয়েছে। মানুষ মানুষকে ভয় দেখায় 'রক্ত শুষে খাব।' ভয়াবহতার বর্ণনায় টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত চোষার কথা উল্লেখিত হয়। সুদখোর রক্ত শুষে নেয় ইত্যাদি বহু বাচনভঙ্গিতে রক্ত শোষা বা চোষার বর্ণনা পাই। কিমমতি বিস্তারেণ ?

তবে যে-যে মানুষ রক্ত বার করে নেয়, তারা নিশ্চয়ই অধম ব্যক্তি, পৈশাচিক স্বভাবের লোক। কিন্তু হিতার্থেও রক্ত নেওয়া হয়। যথা এক দেহের রক্ত অন্য দেহে চালানা করবার জন্য। সেখানে বহির্গত রক্ত অন্যকে জীবন দান করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রক্তশোষা মানবিক অবদান, অবশ্য শোষিতের ক্ষতি না করে। এই সূত্রে বলি যে ইয়াহিয়া খানের সৈন্যের নিরীহ বাঙালীকে ধরে জোর করে দেহের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নেওয়া অন্য আহত সৈন্যের নিরাময়ের জন্য হলেও সম্পূর্ণ পৈশাচিক।

আমার অবশ্য রক্তদানের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় জগতের সর্বাপেক্ষা হিতকারী ব্যক্তিদের কথা, অর্থাৎ কিনা আধুনিক ডাক্তার। বর্তমানে অনেক চিকিৎসায় দেহের শেষ রক্তবিন্দুও প্রয়োজনস্থলে দান করতে হয়। অনেকের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কথাটা অত্যুক্তি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নয়।

চক্রাকারে ভ্রমণে নিজের প্রতিও বক্র দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে নিক্ষেপ করতে হয় বৈকি।

একদা অ্যালার্জির কারণ নিরূপণার্থে এক হাসপাতাল বা নার্সিংহোম বা কোনরূপ এক চিকিৎসাকেন্দ্রে থাকতে হয়েছিল।

যত রকম রক্তপরীক্ষা ভূ-ভারতে সম্ভব ততদূর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হল। দেহের অর্ধেক রক্ত চলে গেল। তারপরেও গভীর রাত্রে শুয়ে আছি, বলা নেই, কওয়া নেই ঘরে ঢুকে একজন কেউ টকাস করে সিরিঞ্জ চালিয়ে আধসের রক্ত তুলে নিল। প্যারাসাইট দেখা হবে।

আরও গভীর রাত্রে একদিন আধো ঘুমন্ত অবস্থায় গেল ফাইলেরিয়া পরীক্ষার রক্ত।

তারপর কথা নেই, বার্তা নেই, ওখানকার গবেষণারত ছাত্রবৃন্দ নিজে থেকে যখন-তখন আমার কেবিনে ঢুকতে লাগল। সুমধুর আলাপনের জন্য নয়, মমতাপ্রকাশ হেতু নয়। অতি নির্মম ও বস্তুতান্ত্রিক প্রথায় রক্ত শোষণের জন্য। তারা জ্ঞানপিপাসু, নিজেরা গবেষণা করে দেখবে।

আমার অবস্থা সঙ্গীন। খাদ্যনিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে কঠোর-ভাবে। হজমের ঔষধ দেওয়া হয়েছে, পারগেটিভের বরাদ্দ হয়েছে। বরাদ্দ হয়নি স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় খাদ্যের। এদিকে রক্ত শোষণ চলছে। ফলে এক প্রভাতে আমি যাকে প্রাকৃত ভাষায় 'ভিমরি' বাওয়া বলে, তারই উপক্রম করলাম চোখের সম্মুখে ঘূর্ণমান কালিছায়া দেখে। পাশের ক্যাবিনের রোগিণীর ফিরিঙ্গী নার্স ছুটে এসে বলেন, 'শোন, কিছু খাওনা কতক্ষণ?'

গত রাত্রে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষামূলক আহার্যের বর্ণনা শুনে তিনি সবেগে স্বীয় রোগিণীর যাবতীয় খাদ্য অবলীলাক্রমে এনে আমাকে তক্ষুণি খাওয়ালেন। সে যাত্রা রক্ষা পেলাম।

এ তো একটি প্রতিষ্ঠানের কথা। আমার জীবনটাই এই। গলায় ব্যথা। ডাক্তার দেখালাম। আগে রক্তের রিপোর্ট। কান-কটকট, চোখে ফোঁড়া, নাকে অস্বস্তি। ব্যস্, ক্লিনিকে দেহের অর্ধেক রক্ত বেরিয়ে গেল। আছাড় পড়ে বুকে ব্যথা, ভুল ওষুধে বুক ধড়পড়। সাত-আট রকম রক্ত দেখার পরে বিছানা ছাড়ার অনুমতি মিলল।

সবই আমার হিতার্থে, আমি জানি। ডাক্তারের মত উপকারী বন্ধু কেউ নেই, মানি। এমনি করেই বহু লোককে বাঞ্ছিত বা কখনও অবাঞ্ছিত আয়ু তাঁরা দিয়ে থাকেন, বুঝি।

তবু চিকিৎসা-শাস্ত্রের পরিপোষণের জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিতে হবে কেন, আমি জানতে চাই।

আমার ব্যাধিতে অন্য একজন সমতুল্য ব্যাধিগ্রস্তের রক্তের রিপোর্টে কেন কাজ চলবে না? বেশ কাজ চলে।

অতএব, চিকিৎসকবৃন্দের প্রতি আমার সবিনয় ও সানুনয় অনুরোধ, যেন তাঁরা নতুন ভাবে ভাবিত হন। এটা নতুন চিন্তাধারার যুগ।

—:::***:::—

"সভারাক্ষসী কিছুতেই মুক্তি দিল না।"

হায় রবীন্দ্রনাথ, আপনি কত কথাই না বলে গেছেন। কত দিনের কত কথা। সেইসব কথার মালা নিয়ে আজ আমাদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

অনেক কথাই মহাকবিজনোচিত হয়নি কখনও কখনও গৌড়-জনের কাছে কিছু বিসদৃশ্য মনে হয়েছে নিঃসন্দেহে; যথা উপরে উদ্ধৃত বচনাংশ। "শনিবারের চিঠির" বঙ্গপ্রেমী সম্পাদক সজনী-কান্ত দাস উক্ত বচনের অনুযায়ী একখানি নিদারুণ কার্টুন চালিয়ে ছিলেন সেকালে।

অতি শ্মশ্রুগুম্ফশালী, জোব্বাধারী এক ব্যক্তিকে রাক্ষসী আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে। সে ব্যক্তি নিরুপায় হতাশায় হাতপা ছুঁড়ছে। সকলেই কার্টুনের বাহারে হেসেছিলেন সেদিন।

কিন্তু আজ আমরা সেই সভারাক্ষসীর কবলে চলে গেছি। এটা সভার যুগ। সব ব্যাপারেই সভা। যত্র তত্র দিনে অদিনে সভা।

এখন সভা হলেই চাই বক্তা, রাজনীতির সভা বা পথসভায় না হলেও শোভন সভায় চাই প্রধান অতিথি, চাই সভাপতি।

অনূঢ়া নারী অহেতুক অনুকম্পা পায়, পতি ভিন্ন আবার নারী-জীবন কি? ঠিক্! সেইরূপ 'পতি' না থাকলে আবার সভা কি?

সভা যদি রাক্ষসী হয়, হিড়িম্বা হয়, তবে তো সভাপতি মধ্যম পাণ্ডব অর্থাৎ বৃকোদর বা ভীম।

মধ্যে মধ্যে বোঝা যায় যে, উদ্ভোক্তাবৃন্দ পৌরাণিক চিত্রখানি বিস্মৃত হননি মোটে। সভাপতির সভা যদি হিড়িম্বা হয়, তবে তো সভাপতি···বৃকোদর বা ভীম। সম্মুখে আহার্য সাজানোর সময়ে এখনও কেউ কেউ ভীমের আহার্য-প্রীতির কথা স্মরণ করে সদয় হয়ে থাকেন।

সভাপতি যদি অগ্নিমান্দ্যে ভোগেন তিনি বিষণ্ণ হন। এ যেন সামর্থ্যবিহীন পুরুষের পায়ে আত্মনিবেদিতা সুন্দরী। ভোগের ক্ষমতা নেই অথচ লোভের উদ্রেক আছে। সুতরাং মন খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

যদি সভাপতির থাকে ডায়াবেটিস কিম্বা রক্তচাপ বৃদ্ধি, তিনি অনুরোধে ঢেঁকি গেলেন। নিমন্ত্রণবাড়ীর অতিথির মত ভেবে নেন, একদিন খেলে ক্ষতি হবে না।

পরের দিন ডাক্তার, ঔষধে টাকা বেরিয়ে যায়। হতোস্মি! লিখতে লিখতে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। কম্পচোখে দেখলাম

কোনও এক সভার অন্তে আতিথেয়তার উদ্দেশে সভাপতিকে একটি সুসজ্জিত ঘরে বসানো হল। ঘরভর্তি আসবাব, থালা ভর্তি খাদ্য।

সভাপতি হাত লাগালেন।

কিছুক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি—সব পরিস্কার। শুধু একখানি চেয়ার বেঁচেছে, যেটায় ওই সভাপতি বসে আছেন।

যাকগে, চটক ভেঙ্গে দেখলাম যে, এক গাঁজাখোরের গল্প লিখে বসেছি। দোহাই ধর্ম, আমি গাঁজা খাই না। চোখেও দেখিনি গাঁজা, পাতার মত দেখতে, কি গুঁড়োর মত দেখতে জানি না।

সভার কথা লিখতে বসে অবান্তর কথা বলার কারণ নেই কিছু।

কেঁদে-কেটে গড়িয়ে গড়িয়ে যে দু'একটা পরীক্ষা পাশ করেছিলাম প্রবন্ধপেপারে তো ভাল নাম্বারই পেয়েছিলাম। তবে এমন হল কেন? অবিরত বৃষ্টির ফলে মনটা হয়ে গেছে ডাম্প্, ছাতা দেখে দেখে ছাতা ধরে গেছে।

সভ্য কি আপনারা সকলেই জানেন, হাড়ে হাড়ে জানেন। নিউম্যানের মত প্রত্যেক বস্তুর উপর সংজ্ঞা আরোপ করা চলে না। সভার ডেফিনিশন দিতে গেলে দুশোটা হাত আমার দুখানা কানের প্রতি প্রসারিত হবে। শুধু এইটুকু বলে যাই যে, সভা একটি ডাইনামিক্ বস্তু, ষ্টেটিক নয়। গতিশীল, স্থিতিশীল নয় বলছি সভা মানুষ বা জনতা দ্বারা গঠিত হয় বলে নয়। সভার প্রথম ও সভার শেষ এক থাকে না। লোকজনেরা শেষের দিকে চলে যায় বলে?

না, সভাপতির সমাদর দেখে।

আদ্যে ও অন্তে এক নয়। যদি বিশ্বাস না করেন (আমিও সেই স্বপ্নময় শৈশবে বিশ্বাস করতাম না), তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেব।

বাইরে সভা-সমিতির তোড়জোড় বেশী। প্রায় করদ নৃপতির সম্মানে নিয়ে যায়। কিন্তু আলোর নীচে অন্ধকার থাকে জানেন আপনারা। সমস্ত আলোয় না থাকলেও মধ্যে মধ্যে থাকে, সেখানে নীয়ন-লাইটের ব্যবস্থা নেই।

সভার দিন সকাল বেলায় হাজির হলাম এক মফস্বলী শহরে আমি এবং এক খ্যাতনাম্নী লেখিকা, প্রধান অতিথি ও সভা-নেত্রীরূপে।

যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনা মিলে গেল। গাড়ী হাজির সর্বদা। আশে-পাশের জায়গাগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল। এক বাড়ী দ্বিপ্রাহরিক নিমন্ত্রণ অন্য বাড়ী চায়ের আয়োজন। এলাহী কাণ্ড।

সভা জনপরিপূর্ণ, বিরাট প্যাণ্ডেল। মঞ্চ দুইমানুষ সমান উঁচু করে নির্মিত। বসলাম সেখানে, মালা পরানো হল।

হায়, আমার জন্মপত্রিকায় পরাশরী রাজযোগের উপস্থিতি। বিভিন্ন সভায় মালা পরেই জীবন কাটল, বরমাল্য পরা ঘটে উঠল না। রাজমহিষী না হয়ে সভা-মহিষী হয়েই গ্রহনক্ষত্রের চমকপ্রদ সংস্থান ব্যর্থ করে দিলাম।

শৈশবে সভাপতিকে মাল্যদান আমার নিয়মিত প্রোগ্রাম ছিল। মাতা দাপাদাপি করে বলতেন, "সকলের গলায় মালা পরিয়ে পরিয়েই এর মালাপরানোর যোগ শেষ হয়ে গেল।"

আহা, আমার সেই মাল্যদানের যুগ!

শরৎচন্দ্র থেকে সুরু করে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণকে পর্যন্ত মালা পরিয়েছি। জীবনে আর কোথাও না পারি এক্ষেত্রে রেকর্ড রেখে যাব।

যাকগে, ছাতাপরা মন আবার অবান্তর প্রসঙ্গে চলে যেতে চায়। কানে ধরে তাকে ফেরাই।

সেই জনারণ্যের মধ্যে সুউচ্চ, পৃথিবীর সাহিত্যসভার মধ্যে একটি

উচ্চতম মঞ্চে বসেছি আমরা। পরে শুনেছিলাম উক্ত মঞ্চে সরস্বতী প্রতিমা বসানো হয়েছিল। বিসর্জনের পরে সেই মঞ্চ সারস্বত ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়েছে।

অত ঊর্ধ্বে অবস্থান যেন কেমন-কেমন লাগছিল। ঠিক সাহিত্যসভার মত নয় যেন। যেন গভীর জঙ্গলে ব্যাঘ্রশিকারীর শিকার-মঞ্চ।

আমার অনুভূতি থেকে মিলিয়ে গেল জনতা, দূরে গেল বর্তমান পরিবেশ। হঠাৎ মনে হল বাঘ-শিকারের মাচায় বুঝি বসে আছি।

অবচেতন মনে তখনি বিপদের সঙ্কেত এসে গিয়েছিল। বাঘ না হোক, বিপজ্জনক অবস্থা।

দীর্ঘ রাত্রি ধরে চলল অনুষ্ঠান। কলিকাতা নয় যে, 'কাজ আছে' বলে চলে আসা যায়। ওখানে যাব কোথায়? অবশেষে হিমার্ত গভীর রাত্রে থামল অনুষ্ঠান। কলিকাতার বাইরে বৃষ্টি পড়ে মাঘের শীত প্রবল আকার নিয়েছে।

রাত্রির আশ্রয় একটি রম্য হোটেলে। আমাদের দু'জনের একখানি ঘর বুক করা আছে।

কিন্তু যাব কেমন করে? ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য প্যাণ্ডেলের বাইরে শীতের রাত্রি নিমেষে জনশূন্য। একখানি গাড়ীও নেই।

প্রশ্ন করলাম, "এতগুলো গাড়ী দেখেছিলাম যে?"

যে ছেলেটি আমাদের পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল সে তখন হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। হতাশভাবে বলল, "ফাংশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যাদের গাড়ী তারা নিয়ে চলে গেছে।"

অবশেষে এক আধভেজা রিক্সা সংগৃহীত হল। আমরা দুই সভানেত্রী ও প্রধানঅতিথি ফুলের মালা দু'গাছা আঁকড়ে ধরে শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে যাত্রা করলাম।

সভানেত্রীর দুর্ভোগ কম ছিল। পরের প্রভাতে তিনি কলকাতা

যাত্রা করলেন। আমার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। আমি দ্বিপ্রহরে সেদিকের যাত্রী হলাম।

ষ্টেশনে কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি তরুণ পৌঁছে দিতে এল। হোটেলের কাউণ্টারে প্রশ্ন এল, "এঁর বিল কে দেবেন?"

তরুণ আম্‌তা-আম্‌তা করে বলল, "কেউ এদিকে নেই দেখছি।"

"তাহলে ডেকে নিয়ে আসুন," কর্মচারীর স্বর রুক্ষ।

তরুণ তথাপি ইতস্তত করছে দেখে আমি বলে উঠলাম, "ঠিক আছে। আমি দিচ্ছি।"

হাতব্যাগ খুলে বিল মিটিয়ে পায়ের ধুলো ঝেড়ে পথে নামলাম।

কিন্তু এটা সার্বজনীন নয়, লাখে একটা এমন মেলে। চক্রাকারে ভ্রমণ করতে করতে বক্র হই কখনও। তখন বক্র বস্তুই নিয়ে পরিহাসে প্রবৃত্তি আসে। কিন্তু সাধারণতঃ উদ্যোক্তারা প্রায় কন্যাপক্ষের ন্যায় বিনয়ী হয়ে থাকেন সর্বদা। অনেকে লোক পাঠিয়ে সমাদরে দূর থেকে আনা-নেওয়া করে থাকেন। পাথেয় বেশী দিতে জিদ করেন। কোনও কোনও সভার স্মৃতি জীবনে পরম সঞ্চয় হয়ে থাকে।

আবার সভাপতি সম্পর্কেও অনেক আপত্তি থাকে। যথা সময়ে না আসা, নাম ছাপবার পরে সরে পড়া, আসা মাত্র 'যাই যাই' রব অনেকেরি ক্ষেত্রে দেখা যায়। ছুতো ধরে রাগ বা বিরক্তি প্রদর্শনও দেখেছি।

একজন পেশাদার সভাপতির গল্প জানি। তিনি এমনই বিভোর ছিলেন ক্রমাগত সভা করে করে যে আয়ুর্বেদিক সভায় রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্তন সুরু করলেন। একজন বাধ্য হয়ে ওঁকে চেতনা দিলে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন এই বলে যে "এমন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁরও আয়ুর্বেদে বিশেষ আস্থা ছিল," ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি নিজে সহস্রবার এমন সভাপতির দেখা পেয়েছি। কয়েকদিন আগে আমি নিজেই গিয়েছিলাম আর কি।

বৃহত্তর কলকাতায় এক বৃহৎ সভায় গেছি। সিঁড়ি বেয়ে ষ্টেজে উঠবার আগে কেমন সন্দেহ হ'ল। এরা রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী বলেছে। কার্ডে উল্লেখ না থাকলেও সময়টা তাই।

কিন্তু এত আয়োজনের কোথাও সেই রবীন্দ্রনাথের অতি বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত বয়সের জয়ন্তীসুলভ আলেখ্য নেই কেন রে?

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল জয়ন্তী?" সবিনয় উত্তর পেলাম, "অ্যাজ্ঞে না, এটি আমাদের বার্ষিক উৎসব।"

চট করে গলায় মালা পড়ল। ঢোক গিলে বসলাম।

সভার রূপ আমূল পরিবর্তিত হতেও দেখেছি অন্যভাবে।

সে-ও এক পল্লীগ্রামে রবীন্দ্রউৎসব। হঠাৎ খোলা মাঠে কাল বৈশাখী। চারপাশে মড়মড় করে গাছ দুলছে। উর্দ্ধশ্বাসে যে বাড়ীতে উঠিয়েছিল ওঁর লম্বা সামনের টানা বারান্দায় ওঠাল সকলকে, মানে যত জনকে ধরে। ওখানে মাইক বসল। অঝোর বর্ষায় আমি সভানেত্রীর কর্তব্য করলাম।

অতঃপর প্রস্তাব এল, এমন বর্ষায় দিন, মাইক ও বাদ্যযন্ত্রাদি আছে। কয়েকটি খ্যাতনামা ক্ল্যাসিক্যাল গাইয়ে উপস্থিত, অতএব খেয়াল ঠুংরী হোক।

আমি চিন্তা করে বললাম, "ঠিক আছে। আমি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়ে দোতলায় চলে যাচ্ছি আপনারা গানবাজনা করুন।"

তাই হ'ল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত 'পরদেশী সেঁইয়া", 'ঠমকি ঠমকি গাগরী ভরণের' গান চলল। আমি শুধু মনোকষ্টে অনাহারে রইলাম।

সভার টেকনিক্যাল দিক আমি কিছু বলছি না। কারণ, আমি টেক্‌নিশিয়ান নই। উদ্যোক্তাদের দলে এক কালে থাকতে হয়ে-

ছিল অবশ্য। হন্নে হয়ে সভাপতি খুঁজে বেড়াতাম।

কিন্তু সে অনেকদিন আগের কথা এখন এক-আধটা চান্স আমিই পাই অতএব উদ্যোক্তাদের পক্ষের বক্তব্য আমার বলা সম্ভব নয়।

কোন অ্যাঙ্গেলে আলো রাখলে সভাপতির চক্ষুকে হনন করা যায়, কি চেয়ারে বসালে হুমড়ি খেয়ে তিনি কুপোকাৎ হন, মিষ্টির টোপ ঝুলিয়ে দর্শককে কিভাবে আটকানো যায়, কেমন করে বাচ্চাদের বুড়ো সাজিয়ে বসিয়ে রাখা যায়, এ সমস্ত তথ্য আর আমার কাছে নেই।

আর এক সভাপতির প্রমাদটুকু বলেই কথা দিচ্ছি আমি বক্‌বকানি শেষ করব।

এক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। একদা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। সদর টাউনের এস ডি ও তাঁর ছাত্র। ছাত্রের চিঠি হাতে সভার উদ্যোক্তা রাজী করে নিয়ে গেছেন সেখানে।

মাঠ পেরিয়ে এক স্কুল বাড়ীর জরাজীর্ণ ঘরে তাঁকে ওঠানো হল। গরমের ছুটী, অতএব পোড়ো বাড়ী। ঘরে দু'খানি প্রাচীন ধুলিধূসর বেঞ্চ ত্রকটা শক্তপোক্ত কাঠের টেবিল ও একখানি চেয়ার আছে বটে।

ভদ্রলোক ভাবলেন ছাত্র হাকিম, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উত্তম ব্যবস্থার। বোধহয় তিনি শিক্ষক ছিলেন বলে, পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন বলে এখানে সাময়িক বিশ্রামে বসিয়েছে। অচিরাৎ সুরম্য অট্টালিকায় পাখাসমন্বিত ঘর পাওয়া যাবে।

সকালে স্নান ইত্যাদি সেরে এসেছেন। সে প্রশ্ন আপাততঃ উঠল না। হাতমুখ ধোবার বাসন। জানালে প্রকাণ্ড একগাড়ু জল বারান্দায় রাখল।

— মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা হোল। ওই ঘরের মেজেয়। প্রকাণ্ড

অমার্জিত ভরণের থালাভর্তি ভাত। ভাতে দুর্গন্ধ কটু ঘি ছড়ানো। এক বাটীতে প্রকাণ্ড একটা মুড়ো আস্ত। ব্যাস্।

মাছ ভাত খাওয়ানো প্রথা। অতবড় মাছের মুড়ো দিয়ে আতিথেয়তার চরম করেছে। আর কি চাই ?

অপ্রবৃত্তির সঙ্গে কয়েকগ্রাস খেয়ে ভদ্রলোক সভয়ে প্রশ্ন করলেন, "স্নান-টান কোথায় করব ?"

"কেন ? ওইযে মাঠের মধ্যে পুকুর আছে।"

"শোবার ব্যবস্থা ?"

"বেঞ্চ দুটো জোড়া দিয়ে দেব। দিব্যি শোবেন।"

এবার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রশ্নে উত্তর এল, "ওই তো মাঠ আছে। পুকুরে জল সরবেন।"

ভদ্রলোক এবার ক্ষেপে উঠে ছাত্রকে তলব করলেন। মোটা-মুটি ব্যবস্থা অন্যত্র হয়ে গেল।

এ সমস্ত কথা যা লিখছি অকাট্য সত্য। পাঠক-পাঠিকা এক কাজ করুন না।

আমার ঠিকানায় ভরি ভরি তামা, সুদৃশ্য টবে তুলসী গাছ, বড় বড় ধাতব ঘটীভরা গঙ্গাজল (রূপোর ঘটি হলে ছোটতেও চলে) পাঠান। আমি ও সমস্ত ছুঁয়ে শপথ করে বলছি আমি একটি কথাও মিথ্যা লিখিনি।

নমস্কার !

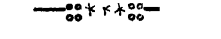

না, না, একদম না। ওসব কিছুটি নয়। যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে লেখবার পক্ষে আমি অনধিকারী। যে পাঠকের শ্রবণলালসা হয়, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রম্' খুলে দেখুন।

তবে এমন একটা নাম দিলাম কেন?

মানুষের মনের এক দুর্দম গোপন প্রবৃত্তিকে উস্‌কে দিয়ে লেখাটির পাঠক বাড়াবার উদ্দেশ্যে!

দেশে ও বিদেশে পণ্যমূল্য বর্ধনের প্রক্রিয়া এক।

এক অতি প্রসিদ্ধ ইংরেজলেখকের ততোধিক প্রসিদ্ধ প্রকাশকের টোপ ফেলা দেখি।

বইখানির প্রথমে এক পাতায় পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। স্নেহশীল শ্বশুর ও পুত্রবধূ সম্পর্কে বর্ণনা। শ্বশুর ও পুত্রবধূর স্বাভাবিক স্নেহ-বিনিময়ের দৃশ্য প্রচারিত হয়েছে নিম্নোক্ত-রূপে—"She took his hand···It went straight to his heart. He gentiy kissed her hair"—বইএর এই লাইন প্রচারপত্রে লেখা হয়েছে :—"···slowly, gently he beant & kissed her—"

সুকৌশলে 'hair' বা কেশচুম্বন কথাটি বাদ গেছে। মনে হয় কি দারুণ নিষিদ্ধ ব্যাপার ঘটছে!

তবে আমিও বেশ করব, খুব করব। "মহাজনো যেন গতো স পন্থাঃ"। আমিও ওইভাবে রচনার আকর্ষণ বর্ধন নিমিত্ত শিরোনামা দেব।

এক কথা বলে অন্য কিছু, এক উপলক্ষে সেটির ব্যবস্থা না করা দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলাম। এই সেদিন লাবণ্য চায়ের নেমন্তন্নে ডাকল। যেয়ে পেলাম হাই-টীর খাদ্য। রাধাবল্লভী, আলুর দম্, ছানার পায়েস ইত্যাদি। কিন্তু হায় হায়, আসল বস্তু আসরে নামল না। চায়ের দেখা পেলাম না। একজন মিন্‌মিন্ করে চায়ের উল্লেখ করেছিলেন বটে, কিন্তু আকণ্ঠ ভোজনে পরিতৃপ্ত অন্যান্য সকলে নির্বিকার। লাবণ্যও গা করল না।

আমার লেখাটিও আজ সেই টী-পার্টি। প্রচুর ভোজ্য, কিন্তু চা অনুপস্থিত।

মুনি ঋষি এবং মহাপুরুষেরা বলে গেছেন—ব্রহ্ম-আস্বাদন রমণ-সুখের সমান। কোটি রমণসুখ। স্বয়ং পরমহংসও একথা বলেছেন। তিনি রমণসুখ অনুভব না করে কথাটার সমর্থন করেছিলেন বলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাই না! তাছাড়া ব্রহ্মকে জানাও তো আপেক্ষিক সত্য।

যাই হোক, যেদিন এ সমস্ত কথা হাতে পেয়েছি, সেদিন থেকে বুঝেছি ধর্ম ও যৌনতা স্বাদে সমান। একটি ধর, অন্যটি ছাড়। এক অন্যের পরিবর্তে হতে পারে নিশ্চয়। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য স্ত্রী ত্যাগ করেছিলেন। শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ দারপরিগ্রহ করেন নি। ব্রহ্মচর্য ও ধর্ম যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকে। সন্ন্যাস ও কৌমার্য, আশ্রমবাস ও স্ত্রীসঙ্গ-বর্জন। ওই ঈশ্বরের স্বাদের উদ্দেশ্যে, যে স্বাদ কোটী রমণসুখেরও অধিক। ছোটটা ছেড়ে বড়টা ধর—এই কথা পাওয়া যায়। তবে লাভ কি, আদর্শটা—

কি? সেই একই বস্তুর আস্বাদন চাই, বেশী পরিমাণে শুধু, না কি?

পাঠক, আমাকে ছ্যাবলা ভাববেন না, আমি জিজ্ঞাসু মাত্র। আমি ধর্ম সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারি না বলে নিত্যই দাপাদাপি করে থাকি। এক এক জনের কাছে ধর্মের এক এক রূপ দেখে গোলমাল হয়ে যায়।

মোটের উপর ধর্ম ও যৌনতায় সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, এহেন ধারণা মনে বদ্ধমূল ছিল। কারণও পেয়েছি।

সেকালের প্রচণ্ডতপা মুনিঋষিরা অবশ্যই ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংযমশক্তির প্রশংসা করা চলে কি? সবিনয় জিজ্ঞাসা। পৌরাণিক দেবদেবীর কথা বাদ দেওয়াই ভালো। সুকঠিন তপস্যায় বসতেন ঋষিবর, আর অপ্সরা এসে তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দিত। কোটী সুখস্বাদ ব্রহ্মলাভ পরিশ্রমসাপেক্ষ, হাতের কাছে একাংশ পেলে ছেড়ে না দেওয়া বুদ্ধির লক্ষণ।

যাকগে, এ ধরনের কথা না বলাই ভালো। কে আবার কি আপত্তি তুলবেন। কিন্তু ধর্ম ও যৌনতাকে একত্রে তুলনীয় হতে দেখে আমি একদা এক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলাম।

এক শহরের যক্ষ্মাহাসপাতালের কোনও উৎসবে গেছি নিমন্ত্রিত সভানেত্রী রূপে।

সভা-অন্তে স্বাভাবিকভাবেই একটু ঘুরেফিরে দেখা, রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে চা-এ বসলাম। তিনি ও তাঁর স্ত্রী কথাপ্রসঙ্গে জানালেন যে, টি. বি. রোগগ্রস্তের মধ্যে কখনও বা কামপ্রবণতা দেখা দেয়, ফলে তাঁরা অসুবিধায় পড়েন রোগীদের মানসিক শান্তি বজায় রাখতে যেয়ে। মন ঠিক না থাকলে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা শক্ত।

আমার মুখ দিয়ে মন্ত্রের মত বার হয়ে গেল, "Give them religion."

"মানে ?" তাঁরা প্রশ্ন করলেন।

"ধর্ম এনে দিন এঁদের মধ্যে। ধর্ম ও যৌনতার তীব্রতায় মিল থাকে। যৌনতার পরিবর্ত ধর্ম অনায়াসে হতে পারে। দেখেন না সন্তবিধবা ধর্মে মন দেন বিপত্নীক ধর্মসভায় ভিড় করেন। মনটা যদি ধর্মের দিকে এঁদের পরিচালিত করতে পারেন, তবেই মুক্তি।"

উভয়ে কথাটার তাৎপর্য গ্রহণ করে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, "কি করতে হবে ?"

"হাসপাতালের মধ্যে মধ্যে দেবদেবী, অবতারের মূর্তি বসান। ধর্ম বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা রাখুন। ধর্মগ্রন্থের পাঠচক্র খুলুন।"

ওঁরা চিন্তিত হয়ে বল্লেন, "সব থেকে কাজ কোনটায় হবে ?"

"যাতায়াতের হলটার মধ্যে মূর্তি বসান। চোখের সম্মুখে নিত্য দেখবেন ওঁরা। বিরাট মূর্তি রাখুন।

আরও বিপন্ন সুরে ওঁরা বল্লেন, "টাকার যা টানাটানি! তা একটা দিয়ে আরম্ভ করা চলে। হলটাও বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া হয়ে আছে। প্রথমে কোন্ মূর্তি দেব ?"

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, "দেবদেবীর মূর্তি প্রথমে না দিয়ে মানুষের মূর্তি দিন। মানুষ দেবতা হয়ে গেছে। দেখে ওঁরা অনুপ্রেরণা পাবেন। কোনও অবতার।"

"অবতার ? তাহলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বসাই ?"

"সর্বনাশ! না, না, একদম নয়। শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই তাঁর লীলাখেলা মনে পড়ে উল্টো ফল দেবে। আপনারা বরঞ্চ বুদ্ধদেবের মূর্তি বসান। রাজার ছেলে হয়ে তিনি ভরাযৌবনে সুন্দরী স্ত্রী, রাজত্ব ত্যাগ করে নির্বাণের মন্ত্র দিলেন। কামকে জয় করা, মায়ের মায়া প্রতিহত করা বিষয়ে তাঁর অবদানের তুলনা নেই। বিরাট বুদ্ধমূর্তি বসিয়ে দিন। কামনা ত্যাগ করতে শিক্ষা পান এঁরা।"

তারপর প্রায় দু'তিন বছর ওখানে যেতে হয়নি। তবে শুনেছিলাম যে বিরাট বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রোগী ও রোগিণীরা সেখানে মোমবাতি জ্বালান, ধুপ-ধুনো পোড়ান, জপতপ করেন।

মনে আত্মপ্রসাদ নিয়ে আনন্দে ছিলাম।

একদিন আবার ডাক এল, "আসুন, একটা গুরুতর পরামর্শ আছে। সভাও হবে, কথাও হবে।"

গেলাম কৌতূহল নিয়ে।

ওঁরা আমাকে ঘরে প্রথমে বসিয়ে বললেন, "বেজায় বিপদে পড়েছি আমরা প্রথমে আশানুযায়ী ফল পাওয়া গেল। এঁরা সকলে সাত্ত্বিক হয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে এখন চরমে উঠেছে।"

"সে কি!"

"এঁরা মাছ মাংস ত্যাগ করছেন একে একে অহিংসা অবলম্বন করে। অথচ জানেন তো, আমাদের চিকিৎসায় আমিষ খাদ্য প্রধান অঙ্গ। কয়েকজন আবার ঔষধপত্র খেতে চান না। বলেন, 'আমরা নির্বাণলাভ করতে চাই, চিকিৎসার আর কি প্রয়োজন?' এখন আমরা তো হাসপাতাল উঠিয়ে দিতে পারি না!"

"বলেন কি? এতদূর গড়িয়েছে?"

"এই সব নয়, আরও আছে। এখানকার রোগীদের ধর্মভাবের কথা শুনে অনেক লোক দেখতে আসেন। সমবয়স্ক একটি তরুণের দল জুটে গেল। তারাও ভক্ত হয়ে উঠল, বৌদ্ধভক্ত। ফলে তারা বিবাহে আপত্তি জানিয়েছে। দু'চারজন ঠিক—করা বিয়ে ভেঙেও দিয়েছে। কন্যাপক্ষ আমাদের ওপরে চটে আগুন। ঢিল ছুঁড়বে এর পরে। কি করা যায়? একবার বুদ্ধি দিয়েছিলেন, বিপদে পড়েছি, এবার একটা পরামর্শ না দিলে আপনাকে ছাড়ছি না।"

আমিও বিপদে পড়লাম। মাথায় কিছু আসছে না। অথচ স্বামী-স্ত্রী উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। ইতস্তত প্রতীক্ষু মুখগুলিতেও আশা। আমি একটা কিছু বাতলে দেব অবশ্যই।

সময় নেবার জন্য অগত্যা বললাম, "চলুন' একবার মূর্তিটা দেখে আসি। একবারও দেখিনি কিনা। তারপর ভেবে দেখি কি করা যায়।"

মূর্তির কাছে এলাম। মরি মরি, সে কি মূরতি! শিল্পী রাম-কিঙ্করের মহান ভাস্কর্য সেখানে বিশালতার রেসে পরাস্ত হয়ে যায়। প্রকাণ্ড বগিথালার মত চওড়া ও চ্যাপ্টা মুখ। চারটে পটল একত্রে চিরলে সেই চোখের উপমা পাই। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, হাতে বরাভয় মুদ্রা।

তখন রোগীর দল সভায় আসীন হয়ে আছেন। স্থানটি নির্জন। শুধু ফল-ফুলমালা, ধূপদীপের পাহাড় সেই পাহাড়সমান মূর্তির পাদদেশে।

"বলুন, এখন আমরা কি করব?"

আমি তখন সভায় দু'চার কথা বলে পালাতে পারলে বাঁচি। নিজের কীর্তি দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু কিছু বুদ্ধি না দিয়ে এঁদের হাত থেকে পরিত্রাণের আশা নেই।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত মাথায় বুদ্ধি খেলল। বললাম, "এক কাজ করুন। এটিতে রাতারাতি রমণীমূর্তিতে রূপান্তরিত করে দিন। তাহলেই সমাধান হবে। এঁরা আবার পূর্ব সত্তায় ফিরে আসবেন।"

"কিন্তু পূর্ব সত্তায় অসুবিধা হচ্ছিল বলেই না—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্লাম, "আহা, পূর্ব সত্তায় ফিরে আসতেও সময় লাগবে। ততদিনে অনেকে সুস্থ হয়ে চলে। যাবেন।তারপরে একদিন মূর্তিটি উপড়ে এখানে, না, না, শুধু ধর্ম নয়, নীতি ও স্বাস্থ্যতত্ত্বের ক্লাস খুলে দিন। এছাড়া উপায় দেখছি না।"

কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত, "এত বড় মূর্তিকে নারী করা, তায় পুরুষ-মূর্তিকে স্ত্রীলোক করা সম্ভব নয়।"

"নয় কেন? পৃথিবীতে অহরহ কত কি হচ্ছে! ডিম থেকে হাঁস, গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি। এ কোনও জীবন্ত বস্তু নয়, প্রতিবাদ করতে পারবে না। কাজ কত সহজ হয়ে যাবে, বুঝছেন না?"

তবু তাঁরা মানতে চান না, "কেমন করে করা যায়?"

"কেন? চুলের চূড়া আধুনিক খোঁপা, শুধু কতকগুলো ফুল গুঁজে দিন! কানে কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো কর্ণভূষণ দিন। গলায় কণ্ঠি, সরস্বতীহার পরান। কটিবস্ত্র ঠিক আছে, অত্যাধুনিক ফ্যাশান ওটা। শুধু ঊর্ধ্বাঙ্গে কাঁচলি এঁকে দিন। ওই প্রসারিত হাত ভরে ভরে চুড়ি পরান, আংটি দিন। রুচি অনুযায়ী, হাত-ব্যাগও ঝোলানো যাবে, পায়ে চপ্পলের জায়গা হবে। যান, শিল্পী ভাস্কর ডেকে নিয়ে কাজে লাগুন।"

"কিন্তু মুখের ভাব? একটা মডেল হলেও—"

আমি কথাটা লুফে নিলাম, "মডেল? হ্যাঁ, ওই যুগেরই বলে দিচ্ছি। পাটনা মিউজিয়ামে তিষ্যরক্ষিতার মূর্তি দেখে ফলো করুন। চোখে কাজল দিয়ে টেনে বেঁকিয়ে দিন, মুখে-ঠোঁটে রং দিয়ে লাস্যভাব আনুন।"

"তিষ্যরক্ষিতার মূর্তি দাঁড়ানো, এটি বসা মূর্তি।" আপত্তি হল।

"তাতে পেছিয়ে থাকলে চলে না। এযুগে দাঁড়ানো লোকেরা হরদম বসে পড়ছে, দেখছেন না? মুখের, পোশাকের ভাবটাব-গুলো বজায় রাখতে পারলেই হবে। একজন না হয় পাটনা চলে যান।"

আমার এই উপদেশের কী ফল হয়েছিল জানি না। কারণ আর কখনও ওখানে আমার ডাক আসেনি।

ভীত চিত্তে শিরোনামাটা লিখে থর্‌থর্‌ চিত্তে কলম নামিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে মনে সাহস আনছি।

এটা গবেষণা-রচনা নয়। গবেষণার ক্ষমতা আদৌ আমার নেই সম্প্রতি। ক্রমাগত বোমার শব্দ শুনে শুনে মাথাটা এমন হাল্কা হয়ে গেছে, কি বলব! রাত্রে চমকে উঠে বোমার আওয়াজ শুনি। শব্দের তারতম্য অনুসারে দিক নির্ণয় করার চেষ্টা পাই। বলা বাহুল্য কখনও আমার অনুমান নির্ভুল হয় না। লাভের মধ্যে প্রাত্যহিক নৈশনিদ্রা ব্যাহত হয়ে ইন্‌সম্‌নিয়ায় ধরে।

যে কোন জোর শব্দ শুনলে চমকে ভাবি বোমা। সান্ধ্য ধুনুচির ধোঁয়া দেখে ভাবি বারুদের হল্কা। আমি দারুণ ভীতু লোক কিনা। 'চক্রবক্রের' ভূতের আলোচনা লেখার পরে সন্ধ্যার অন্তে একা ঘরে পারতপক্ষে থাকি না।

যাই হোক, কথাটা হচ্ছে, বর্তমান যুগ শ্রমিকের যুগ। শ্রমিক কে? যিনি শ্রম দান করেন বৃত্তির ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা সকলেই শ্রমিক। আমাদের অহোরাত্র লেখনী চালনা দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে হয়। কেউ বসিয়ে খেতে দেয় না। দুখানা ভাল বই লিখে আজকাল খ্যাতির শিখরে বসে থাকা যায় না। নিত্য নিত্য বই প্রকাশিত না হ'লেই আপনি back dated, কি না পশ্চাৎপদ।

অতএব, "খেটে খেটে খেটে
হয়ে গেলাম বেঁটে।"

"এবং বোম্বেটে" কথাটি যোগ করার ভরসা পাইনে। তাহলে আমাদের ট্রেডের লোকেরা খাপ্পা হবেন। এখানেও অনুচ্চারিত কিন্তু গুরুতর ট্রেড-ইউনিয়ন আছে।

আমরা শ্রমিক, ভয়াবহ শ্রমিক।

আমার এক অক্ষম উপন্যাস 'সকাল সন্ধ্যা রাত্রির' অন্যতম নায়ক গৌতম বলছে,—"নিজে যখন প্রকাশক নই, তখন অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। আমার বই থেকে তারা লাভ করে হাজার টাকা, আমাকে দেয় দুশো। তা-ও অনুগ্রহের ভাবে।"

"—প্রকাশকশ্রেণী আজকাল করে খাচ্ছেন। বাড়ি-গাড়ি তাঁরা করে ফেলেছেন, অথচ আমরা অনেক সময় ট্রাম-বাসের পয়সা পকেটে পাই না।"

"শ্রমিকের শ্রম অপহরণ করার দায়ে যারা অভিযুক্ত, এরা তাদের অগ্রগণ্য।"

কিন্তু, রাগ করবেন না, প্রকাশকমহাশয়। আমার ওই অকৃত-অধম উপন্যাস 'সকাল সন্ধ্যা রাত্রির' পাতায়ই আছে—"সব প্রকাশক কি এমনি? ভাগ্যিস নয়। তাহলে তো লেখকরা না খেতে পেয়ে এতদিন মারা যেত।"

এই সুযোগে নিজের বইএর প্রচার করে নিলাম। থ্যাঙ্ক ইউ!

তবে শ্রমিক বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিলাম। এ বড় কঠোর শ্রম। কতকগুলি পাতা কাল কালির আঁচড় দিয়ে নিরেট ভাবে ভরাতে হবে। নইলে কড়ি মিলবে না। কালির হরফে মাথামুণ্ড যাই লিখি, লেখা চাই। মাথা নীচু করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলম চালিয়ে।

ভাবের ঘরে ফাঁকি? কিন্তু লেবার, লেবার চাই। শ্রম দিতেই হয়।

নিজেকে শ্রম দিতে হয়, ফাঁকি দিলে চলে না, সে অন্যের

শ্রমদানও লক্ষ্য করে দেখতে চায়, নয় কি? লেখকের শ্রম নিদারুণ। একবার খাতায় হাজিরা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নসাৎ করা নয়। যন্ত্রীর ঢিমে তেতালায় যন্ত্র চালিয়ে শ্রমচুরী নয়। দিতে হবে মেটেরিয়াল। তবে না পাতা ভরবে, পাঠক পড়ার খোরাক পাবেন।

অতএব আমি বা আমরা শ্রমিক চাই অন্য ক্ষেত্রের শ্রম-দানের হিসাব-কিতাব রাখতে।

গেলাম ব্যাঙ্কে প্রয়োজনে। টাকা আসে না কেন রে? অতিষ্ট হয়ে জানলাম ক্যাশ খোলা, কিন্তু উভয় কর্মী ওখানে এখন নেই।

আমি পুজোর লেখা ফেলে ব্যাঙ্কে গেছি, অস্থির হলাম। এজেন্টমহাশয় নিজে তখন উঠে শ্রম দান করে আমার শ্রমলব্ধ সামান্য কয়েকটি মুদ্রা এনে হাতে দিলেন।

উনি জানালেন, নিত্য এদের আবদার, ছুটি চাই। এত ঘণ্টার বেশী রাখা চলবে না, অথচ ন্যায্য সময়টুকুও তারা থাকে না।

আমি আবার শ্রমদান করতে বাড়ী ছুটলাম। পথে যেতে যেতে মনে হল আমার শ্রমলব্ধ টাকা কয়েকটি ব্যাঙ্কে রাখি বলেই এতগুলো লোকের চাকুরি মেলে। আমি নিরীহ পাবলিক. আমার অসুবিধা ঘটালে নিজেদের পায়ে যে কুড়ুল মারা হয়, ভেবে দেখেন কি কর্মচারীরা?

শ্রমের প্রকৃত মর্য্যাদা সভা বা মিছিল করে বা শ্লোগান ঝেড়ে করার অপেক্ষা উদাহরণ স্থাপনা করা শ্রেয়। আমি নিয়ে যাব, দিতে চাইব না, হয় কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূর্বে কোন এক ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা একজন সহকর্মীর বরখাস্তের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে-ছিলেন! ফলে, খনির পক্ষে অত্যাবশ্যক একটি বিস্ফোরকের

উৎপাদন হল স্থগিত। ফলে কোন এক এলাকার পঁচিশ হাজার খনিকর্মীর কাজ গেল, কারণ বিস্ফোরকের অভাবে খনির কাজ বন্ধ গেল।

আজ শ্রমিকের আন্দোলন কোন পথে?

কয়েকজনের সুবিধার হেতু বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির স্বার্থ উপেক্ষা করা?

প্রেসে অচল অবস্থা, বাজারে অচল অবস্থা। আমি শ্রমিক, কলম চালিয়ে যাচ্ছি। মালিক আমাকে দুঃসময়ের অজুহাতে ঠেকিয়ে মজুরী বিলম্বিত করছেন, হ্রাস করছেন অনায়াসে।

আমাদের অবস্থা খনিশ্রমিকের মত, নয় কি? একটা আদর্শ ধরে চলা, সেজন্য অহোরাত্র সংগ্রাম করা, আর ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা মুষ্ঠিমেয়ের স্বার্থে শ্রমবিরতি এক নয়।

যাঁরা শ্রমিকের জন্য কাজ করেন, তাঁরা শ্রমিককেও নিশ্চয় কর্তব্য শেখান।

শ্রমিকের পাওনা অনেক কিছু মানি, কিন্তু তার দেবারও অনেক আছে। কর্তব্যকর্মে অবহেলা না করা তন্মধ্যে একটি।

একদিন আমার বৃদ্ধা মাতাকে ইলেক্ট্রিকট্রেণে নিয়ে যাচ্ছিলাম শহরতলীর শহরে। প্রমোদ-ভ্রমণে নয়, মৃতকল্প আত্মীয়াকে শেষ দেখার প্রয়োজনে।

বিনা টিকেটের যাত্রীর ভিড় ঠেলে মাতার ওঠানামা দারুণ কষ্টকর হবে বিবেচনায় প্রথমশ্রেণীর টিকেট বেশী দামেই ক্রয় করলাম। বৃদ্ধাকে কেউ সম্মান দেখাবে না, ঠেলে নিজেরা ছুটবে।

প্রথমশ্রেণীর কামরায় আলো ভাঙা, পাখা অচল। সব থেকে ভয়ানক কথা, গদির সমস্ত নমনীয় চামড়া তুলে কাঠ এবং ছোবড়া করা হয়েছে। এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা কাঠে বসা দায়। নিজের

অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিলাম। তৃতীয়শ্রেণীর কামরায় মাতা অন্ততঃ বসে যেতে পারতেন।

সেদিন মনে হল একি দীনতা? যাঁরা শ্রমিক নেতা তাঁরা কি কোনও নীতি শিক্ষা দেন না?

শ্রমিকের সংগ্রাম হবে সমস্ত ট্রেনে একটি মাত্র ভদ্র ব্যবস্থার শ্রেণী রাখা, বিনা টিকেটে ফার্ষ্ট ক্লাশে যাওয়া নয়।

বৃদ্ধ ও অসুস্থের জন্য থাকবে প্রথম শ্রেণী একই মূল্যের মাশুলে। সেখানে আমরা বসতে যাবনা।

শ্রেণীভেদ লুপ্ত করার যে প্রয়াস, সেখানে অন্য শ্রেণীর সম্পদ অহেতুক নষ্ট করার মূলে থাকে ঈর্ষা।

ঈর্ষা মানে অবচেতন মনে ওদেরি সমান হতে যাওয়া।

অতএব শ্রমিক সেখানে পথভ্রষ্ট, নয় কি? ভূমিদখল আন্দোলনেও একটি দুর্বল দিক আছে। যিনি প্রচুর ভূমিশালী, তাঁর জমি ভূমিহীন কেড়ে নেবে, বেশ কথা। কিন্তু তাঁর জমির চাষ হয় অন্যান্য চাষীর সাহায্যে। তাঁরা জীবিকাচ্যুত হবেন, যদি না পূর্বাহ্নে নূতন মালিকের চাষে ওঁদের স্থান রেখে দেওয়া না হয়।

আমাকে অহরহ শ্রম দান করতে হয়। পাতা গুণে তবেই মূল্য মেলে। তাই বুঝি অন্য শ্রমিকের শ্রমবিমুখতা পীড়াদায়ক?

শ্রমিক নেবার বেলায় সমস্ত নিক্তি মেপে নেবেন, দেবার বেলায় তবে নিক্তি মেপে দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব, কলকারখানা, ক্ষেতখামারে কোথাও পরিদর্শক থাকবে না। শ্রমিকেরা নিজেই হিসেব করে কাজ করবেন যতটা করা উচিত ও ন্যায্য।

আমার সেকেলে মনে শ্রমিকের একটি চমৎকার সংজ্ঞা গেঁথে গেছে শৈশবপাঠ্য কবিতা থেকে—

"His brow is wet with honest sweat.
He earns whatever he can,
And looks the whole world in the face,
For he owes not any man."

ললাট তাঁর ন্যায়-সঙ্গত কর্মজাত স্বেদ-পরিসিক্ত। তাঁর উপার্জন সামর্থ্য অনুযায়ী।

সমগ্র বিশ্বের চোখে চোখ রেখে তাকাতে তিনি পারেন, কারণ কারুর কাছেই তাঁর ঋণ নেই।

কর্ম ধর্মসোপান। শ্রমিকের ধর্ম শ্রম। অতএব আমি কলম শ্রমিক আবার মাথা নামাই আমার দিস্তাকরা কাগজের ওপর। কলম চালাই। আর কথা নয়।

—:::*:::—

এক বিড়াল আমাদের বাড়ীর অর্ধেক কাজ করে থাকে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

ঠিক এমনি অবিশ্বাস করেছিল কৌশিক, আমাদের বাচ্চা। গল্প শোনার লোভে পাগল সে। গল্প বলার চেষ্টায় আমিও পাগল।

গল্প বলছিলাম, "বিড়াল আমাদের কাজ করে। সকালে ঘরে ঘরে চা দিয়ে যায়। একহাতে রান্নাবান্না করে"—

কৌশিক অবাক হ'ল। দু'চোখ সসারের মত হয়ে উঠল। মোহরের মত গোল-গোল চুলের গোছা খাড়া হয়ে ওঠে আর কি।

জিজ্ঞাসা করল, "তুমি বিয়াল লেখেছ কেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "কি আর করি? চাকরবাকর এখন ভাল পাওয়া যায় না। মানুষের চেয়ে বিড়ালের কাজকর্ম অনেক ভালো। এই দেখ না, সকালে বিড়াল ঘরে ঘরে বিছানা তুলে ঝাঁটপাট দিয়ে গেছে বাজারে।"

কৌশিকের মুখে দুষ্টু হাসি দেখা দিল। পাঁচের নীচে বয়ক্রম হলেও পিছিয়ে থাকবার পাত্র সে নয় মোটে। রবীন্দ্রনাথের পুপেদিদির মত কৌশিকও অবিস্মরণীয় কাল্পনিক চরিত্র 'সে' তৈরি করবার কাজে লেগে গেল। কিন্তু মহাকবির নায়ক ছিল মানুষ, আমরা মহান নই, আমাদর নায়ক হল বিড়াল।

কৌশিকের রস লেগে গেল।

নানাপ্রকারে গল্প বানায়—বিড়ালকেন্দ্রিক।

আমি যদি বলি, "বিড়াল এতক্ষণ পরিবেশন করে সবাইকে খাওয়াল। এখন থলে নিয়ে র‍্যাশন তুলতে গেল!"

কৌশিক সঙ্গে সঙ্গে বলে, "দেখলাম বিড়াল একগাদা জামা-কাপড় নিয়ে দোতলায় এল তেতলা থেকে। সেগুলো ইস্ত্রি করছে। গাছের তলা খুঁটে পাতাটাতা ফেলে পরিষ্কার করল বিড়াল। আমার জন্য আবার ছোট্ট একটা দোলনা টাঙিয়ে দিল।"

কথাগুলো আধো আধো হলেও বাঁধুনী পোক্ত। এমনি করে গল্প বানাতে বানাতে দেখা গেল ঈশ্বর বোধহয় কোনও অকেজো মুহূর্তে আমাদের কথা শুনে ফেল্লেন। কাজের প্রহরে তিনি কানে তুলো এঁটে থাকেন, কারুর কথা শুনে প্রতিকারের ক্লেশ এ ভাবে এড়িয়ে যান।

দেখলাম এক বিরাট সাইজের শাদা বিড়াল বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিড়াল দেখা যায়নি। অথচ সে বনবিড়ালও নয়।

দেখলাম নিদারুণ অবজ্ঞা আমার প্রতি। সে দৃশ্য আবার কৌশিকের মনোমত। আমার লেখার চেয়ারে সেই বিড়াল নির্বিচারে বসে থাকে, নড়েও না আমি বসতে চাইলে। বার বার তাড়া দিলে চটে উঠে বিশ্রী মুখভঙ্গি করে। ধাক্কা দিয়ে দেখি পাথরের মত ভারী। আর বেশী কিছু করবার সাহস হয় না। ছোকরা চাকর সর্বদেহে ওর আঁচড়ের চিহ্ন নিয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। ভাইপো হীরক হাতে আঁচড় খেয়ে ডাক্তারবাড়ী ছুটেছে, কুকুরকামড়ানোর ইনজেকশন নিতে হবে কিনা। হীরকের দারুণ সন্দেহবাই।

কৌশিক আমার অসুবিধা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিড়ালটা কোথা থেকে জলজ্যান্ত উপস্থিত হওয়ায় কৌশিকের কাছে আমার মান রক্ষা হয়। 'সে' কাল্পনিক; রবীন্দ্রনাথও এমন রক্তমাংসে হাজির করতে পারেন নি। আমার বিড়াল নিদারুণ বাস্তব।

দেখতে দেখতে বিড়ালের কর্মপদ্ধতি প্রকট হয়ে উঠল। আমাদের উচ্ছিষ্ট বাসনকোসন ঝিয়ের উদ্দেশে যা পড়ে থাকে, বিড়াল চেটে চেটে একদম ঝক্‌ঝকে করে রাখে। আমি ভাবি, মাকে বলে বাসনমাজা ঝিটাকে উঠিয়ে দেই। বিড়াল অর্ধেক কাজ করে রাখে, বাকী আমরা হাতে হাতে করে নিতে পারি। পয়সা বাঁচবে।

সেদিন ঝন্‌ঝন্ শব্দে ছুটে যেয়ে দেখলাম কৌশিকের খেলনার সেলফ থেকে বিড়াল ল্যাজের ঝাপটায় খেলনা ছড়িয়ে ফেলেছে। বুঝলাম ধুলোপড়া বিড়ালের অসহ্য লাগায় সে ল্যাজকে ঝাড়নের

কাজে লাগিয়েছে। খেলনা ভাঙায় কৌশিক চটে লাল। আমি বোঝালাম, "চাকরবাকর ফাঁকি দেয়, তাই দেখে বিড়াল কাজে লেগেছে। সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলে রাগ করা উচিত নয়।"

আমি খেতে বসলে বিড়াল জানালার ওপাশে প্রাচীরে থাবা গেড়ে বসে প্রতিটি গ্রাস গোনে একদৃষ্টে। আমি নার্ভাস হয়ে যাই, বিড়ালের অনিমেষ দৃষ্টির আওতায় গলায় খাদ্য ঠেকে। ভাবি, ওকি ক্ষুধার্ত, আমার ওর সম্মুখে পুরোচারে খাওয়া উচিত না কি?

ফলে আমার খাদ্য গ্রহণ একদম হ্রাস পায়। বিড়াল এমনি-ভাবে গৃহস্থের খাদ্য বাঁচায়।

সেদিন এক দরকারী জায়গায় যাব। ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা দরকার। বাড়ীর প্রত্যেকেই বেলায় ওঠেন। ঘড়ির অ্যালার্মটা খারাপ হয়ে গেছে। কে তুলে দেবে?

উপায়ন্তর নেই দেখে ভগবানে ভরসা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। যা হয় হবে।

হঠাৎ গলা-বুক যেন পাথরে চেপে দিল কে? ঝপাৎ করে মুখ বুক আহত করে কে লাফিয়ে পড়ল? নখের খোঁচায় মুখ চোখ ছড়ে গেল।

কে রে? দেখি বিড়াল জানালার সীল থেকে ভোরবেলায় আধো অন্ধকারে আমার গায়ে লাফিয়ে পড়েছে।

রাগে গা জ্বলে গেল। যা হয় হোক, আজ আমি জীবে দয়া বিস্মৃত হয়ে নিজের হাতে বিড়ালকে আচ্ছা পিটুনী দেব।

মুখে হাত বুলোতে বুলোতে শক্ত একটা কিছু খুঁজতে লাগলাম।

"দাঁড়াও বাছাধন, আজ তোমাকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।"

বিড়াল কিন্তু পালাবার চেষ্টা করল না। আমার মাথার বালিশে বসে সকাতর স্বরে (তার মার্কামারা হেঁড়ে গলার যতটা সম্ভব) ডাকল, "ম্যাও, ম্যাও।"

তাকিয়ে দেখি বিড়ালের মুখ করুণ।

তখনি আমি বুঝলাম বিড়াল লোকজন নেই দেখে আমাকে উঠিয়ে দিতে এসেছে ঘুম থেকে।

সেদিন থেকে বুঝলাম বিড়াল আমার পরম হিতৈষী। আমি ওর ভাষা বুঝি না, ও আমার ভাষা বোঝে না, অতএব মানসিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র অভাবে ভুল বোঝাবুঝি চলে।

আমার বেশী চা খাওয়া বারণ, অথচ বারণ করার লোক নেই। সকালবেলা কড়া এক কাপ চা (চতুর্থতম) নিয়ে বসেছি, হঠাৎ পেছন থেকে টেবলে কাঁধের ওপর দিয়ে বিড়াল লাফিয়ে পড়ল। আমি কেঁপে ঝেঁপে চায়ের কাপ হাত থেকে অতর্কিতে ফেলে দিলাম। কাপও গেল, চা-ও গেল। কিন্তু আমি তো বাঁচলাম।

বাড়ীর মেয়েরা দামী জামাকাপড় রোদে মেলে দিলে বিড়াল সেগুলো থাবাথাবি করে, ছিঁড়ে ফেড়ে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু সেটাও বিড়ালের শিক্ষামূলক কাজ। মেয়েরা শুয়ে বসে, নভেল পড়ে, সিনেমা দেখে কালক্ষেপ না করে যাতে সীবনবিদ্যায় পারদর্শিনী হয় বিড়াল সেই চেষ্টা করছে।

হাঁড়িতে মাছ থাকে না, ঘরে দুধ থাকে না। বিড়াল সেগুলি পরিষ্কার করে রাখে। বাসী মাছ, খারাপ দুধ নিশ্চয় থাকে। বিড়ালের কাজ জঞ্জাল অপসারিত করে গৃহস্বামীকে অটুট স্বাস্থ্যে ও নিরাপদে রাখা। এই উদ্দেশে বিড়াল প্রায়ই খাদ্যদ্রব্যাদি একটু চেখে দেখে।

রাঁধুনী মাছ, মাংস, ডিম রান্নায় বসলে বিড়াল সেখানে থাবা গেড়ে পাহারা দেয়। চুরির সুযোগ থাকে না। রাঁধুনীর বিড়ালের অগোচরে কিছু মুখে তোলার উপায় নেই। বিড়াল "ম্যাও, ম্যাও" ডাকে দাপাদাপি করে। লোক জড়ো হয়।

বিড়ালের কথা আর কত বলি ?

সচরাচর এরকম বিড়াল দেখতে পাওয়া যায় না।

ইংরেজ লেখক সাকি এক বিড়ালের কাহিনী নিয়ে মাতামাতি করেছেন। 'টবারমেরী' এমন একটা কি বিড়াল? শুধু মানুষী ভাষায় কথা বলা তার অবদান। এর কথা ওর কাছে লাগিয়ে সকলের গোপন তথ্য ফাঁস করে সে হাউসপার্টির দফারফা করেছিল। কেবল টকর্ টকর্ বাজে কথা, কুটোটি ভেঙ্গে দুখানা করেনি।

আমাদের বিড়াল কত কাজের, কেবল সে পারে না টবারমোরীর মত মানুষের ভাষায় কথা বলতে।

ভাগ্যি পারে না। তাহ'লে সে কি আর এতক্ষণ এ বাড়ীতে পড়ে থাকত।

সে পার্লিয়ামেণ্টে চলে যেত।

—:::***:::—

ও মশাই, ওধারে যাচ্ছেন কেন বোকার মত? রংবেরঙের দেওয়াল দেখে হতবাক নাকি?

কদিন আগেই এই গলির বাড়ীখানায় নোনা ধরে এ অংশটা গিয়েছিল আরকি। ইঁটের পাঁজার গায়ে গজাচ্ছিল অশত্থ।

কিন্তু আজ আপনি হঠাৎ দেখলেন ওর ভোল গেছে ফিরে। চড়া সবুজ জানালায় হলদে টান, লাল দেওয়ালে কালো বর্ডার, দরজা খয়েরী। গছের টবে ফলন্ত গাছ। ঘরে পরদার বাহার, দেওয়ালে হিজিবিজি ছবি, কেমন যেন বিচিত্র আকৃতির জিনিষ-পত্র, এক দারোয়ান বসা। স্যার, ওটি নার্সারি স্কুল।

একটি নার্সারি স্কুলের জন্ম হয়েছে পাড়ায়। মশাই, একটা ব্যবসা করবেন? যেখানে শিক্ষাদানও চলে, মনে আত্মপ্রসাদ আসে, বিবেক নামক বস্তুটি যদি এখনও থেকে থাকে, খোঁচা মারে না।

বেশ সহজ ব্যবস্থা। নিজে পশ্চাৎদেশে অবস্থান করতঃ একটি নার্সারি স্কুল খুলে দিন স্ত্রী, পুত্রবধূ বা কন্যাকে সম্মুখে রেখে।

কিছু টাকা প্রথমে খরচ করতে হবে নিশ্চয়। বেশী নয়। ক্যাপিটাল না লাগালে ও ব্যবসা করা সম্ভব নয়। প্রথমে স্থান সংগ্রহ করুন।

(১) একটা-দুটো ঘর, একটু খোলা জায়গা।

(২) কিছু খেলনাপত্র।

(৩) ক্ষুদ্র ডেস্ক, চেয়ার।

(৪) হাতে-আঁকা নানাবিধ চার্ট প্ল্যাকার্ড, ছবি।

এখন রাতারাতি গজিয়ে উঠল এক ফুল, নাম তার নার্সারি স্কুল।

হন্তদন্ত হয়ে অভিবাবক বাচ্চাদের টানতে টানতে নিয়ে এলেন। খুশী মন, কর্তব্য করা হয়েছে। সকলেরি বেবি যায় এই ধরনেয় স্কুলে, তিনিও দিলেন।

এখানে সাধারণতঃ পড়াচ্ছেন কারা? নিশ্চয়ই যথার্থ শিশু শিক্ষায় ওয়াকিবহাল শিক্ষয়িত্রী নয়। তাঁদের যথার্থ বেতন দিতে গেলে যে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। ছাত্রীজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যের সময়টুকু ব্যয়িত হয় শিক্ষিকার নার্সারি স্কুলে। বাচ্চাদের হাতেখড়ি হয়, নিজেরও হাতেখড়ি হয়।

সদা সর্বদা বাচ্চাকে চোখে চোখে রাখা যে শক্ত ব্যাপার। কখনও শিশুশিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং নিষিদ্ধ 'মেজাজ' এঁদের দেখাতে হয়। স্বভাবে ও শিক্ষায় যাঁরা যোগ্যতার ছাড়পত্র পান নি তাঁদের দিয়ে যার যা কর্ম নয়, করাতে গেলে চলে না।

মুখচোখে নখের চিহ্ন নিয়ে বাচ্চা বাড়ী ফেরে। মারামারি স্বাভাবিক বাচ্চাদের মধ্যে, কিন্তু রক্তারক্তি নিশ্চয়ই রোধ করা উচিত। আন্টি তখন হয়তো বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তুতে মশগুল।

তবু অভিবাবকবৃন্দের আনন্দ দেখে কে? অনিচ্ছুক অতিথির সম্মুখে তাঁর ছেলেমেয়ে হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে ইংরেজি নার্সারি রাইম্ আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেয়। পা ঠুকে ঠুকে তালে তালে নাচে ইংরেজী ছড়া ও গানের ছন্দে।

উচ্চারণ-শিক্ষা খাঁটি সাহেবী না হ'লেও তো ফিরিঙ্গী চং-এ হয়। তাড়েই সন্তুষ্ট মা-বাবা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীরব থাকেন।

আর বায়নাক্কা যত হবে ততই সে প্রতিষ্ঠানের গুমোর বা গ্ল্যামার বেশী। ইউনিফর্ম চাই প্রতিটি স্কুলে, চাই পঞ্চাশরকম খাতা, রংতুলী, রঙীন পেনসিল-চক, বই, ব্যাগ, কি নয়?

অষ্টপ্রহর চাঁদা, সমস্ত কারণেই চাঁদা। যত টাকা তোলা যায়, যত খরচ বাঁচানো যায়। উৎসবের দিনেও খাদ্য বিতরণ হয় না। বরঞ্চ হতভম্ব অভিবাকদের মোটা পার্স থেকে দফায় দফায় আদায় হয়।

সাধারণতঃ একটু অবস্থাপন্ন সৌখীন মা-বাবাই বেশী আগ্রহী নার্সারি স্কুল বিষয়ে। অবশ্য আজকাল প্রায় সকলেই অন্যদিকে ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা ছেলেমেয়ের এই প্রকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেই থাকেন। কি জানি সুযোগ সুবিধা গোড়া থেকে না পেলে যদি বাচ্চা জীবনযুদ্ধে পেছিয়ে যায়।

সীমন্তিনী ননদকে সংবাদ জানান, "বাচ্চাটির মাইনে মাসে পঁচিশ, এছাড়া অন্য কী, জামাকাপড় এটা-ওটা। নিত্যি একটা করে গজায় চাহিদা। মাসে পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যায়।"

ননদ ঠোঁট উল্টে বলেন, "মাত্র, তবে ভালই আছ, বৌদি। আমার রিণটিনের জন্যে মাসে সত্তর টাকা লাগে।"

থ্যাকারে সাধে "ভ্যানিটি ফেয়ার" লিখেছেন? নার্সারির কোনও উৎসবে এঁদের দেখা মেলে। বিরাট নকল খোঁপাভরে বিপর্যস্তা নারী, শীতে স্লিভলেসে কাতরা, অর্ধ-উদ্ঘাটিত দেহ সৌষ্ঠবে রমণীরা একটা ছাঁচে তোলা। এ ওর সজ্জা কটাক্ষে দেখে নেন।

আধুনিক শেডের বিতিকিচ্ছি লিপষ্টিক, চোখের নীচে অতি প্রকট ঘন লিপ্ত কালিমা; সর্বপ্রকার মেক্‌আপ ব্যবহারপটিয়সী এই রমণী নার্সারী স্কুলের জননী। জনক সেই ঈষৎ বেমানানভাবে শার্ট ও ট্রাউজারখচিত, গাড়ীর চালক। বিদেশী ফার্মের চাকুরি।

এঁদের সম্মিলিত অবদান নার্সারি স্কুলে। যাঁরা শাশুড়ী-ননদের জ্বালা একদিনও সহ্য করতে চান না, সেই সকল মহিলার ছেলেমেয়ের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন ভুবনবিদিত।

স্কুলের বাস বাড়ীর দরজায় আসে না, অতএব এক মাইল রিক্‌সাযোগে সময়ে অথবা অসময়ে পদব্রজে মোড়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাকে চড়িয়ে দেন বাসে। ফেরার বেলাও তথৈব।

স্কুলের বাস অভাবে নিজের গাড়ী না থাকলে অথবা ওসময় না পাওয়া গেলে বাস-ট্রামে বেবিকে নিয়ে সর্ব কাজ ফেলে ছোটেন নিজে।

প্রায় সারাদিন ব্যয়িত হয় ছেলে বা মেয়ের বা উভয়ের শিক্ষার কসরতে মাতার। যদি চাকুরে হন মা তবে কাজের মধ্যে বিরাম নিয়ে হিসাব করে করতে হয়। বাবার ডিউটি আছেই। কখনও অধিক বেতনে বিশ্বাসী ভৃত্যাদি রাখতে হয় যতদিন শিশু ছোট থাকে বা নিজের যাতায়াত সক্ষম না হয়।

বাৎসরিক উৎসবে গেলে দেখা যাবে আন্টিদের বন্ধুবান্ধব প্লাবিত উৎসবঅঙ্গন। তরুণেরাই আনন্দ করছে বেশী, বাচ্চাগুলো উৎসব বেশে সজ্জিত হয়ে এর ওর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে দ্রষ্টব্য বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন খাতে আবার প্রবেশকী ছাড়াও নানা দর্শনী সংগ্রহের ব্যবস্থা।

ও মশাই, চলে যাচ্ছেন যে, আমায় দারুণ নিন্দুক ভেবে, স্থানত্যাগেন দুর্জনকে প্রত্যাহার করছেন না কি ?

না, না, যাবেন না।

সমস্ত নার্সারি স্কুল এমন নাকি ? মাত্র দু'একটার কথা বলছি, স্যার।

ভালো আছে বইকি, প্রচুর আছে।

আসলে আমার হয়েছে হিংসে।

না, না, স্কুলের কর্তৃপক্ষদের প্রতি নয়। যে যা পারে করে নিক, 'মেক হে হোয়াইল সান্ শাইনস্'। আমি নিজে পারছি না কেন ?

আসলে, আমার হিংসে ওই বাচ্চাগুলির সঙ্গে। অমন বাড়ী-ঘর, ছবি, অমন ক্ষুদে ক্ষুদে মিষ্টি ডেস্কচেয়ার আমি কেন ভোগ করতে পারছি না ?

আমার শৈশব ইনফ্যান্ট বলে একটা কিণ্ডারগার্টেনের অক্ষম চেষ্টায় কেটেছে।

সে কি এই ?

"কিসে আর কিসে ? ধানে আর তুষে ?"

হায়, হায়, আমার শৈশব কেন শেষ হয়ে গেছে ? কেন ওই সুখী ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি আবার ছোট হয়ে একটা নার্সারী স্কুলে যেতে পারছি না ?

আমি নানারকম পোষাক পরব, হাত-পা দুলিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে আবৃত্তি করব, আর আন্টিদের বেজায় ভালবাসব।

—⁂**⁂—

বন্য অবস্থায় কুকুর একরকম, পোষা হলে ন্যাকা। আপনারা তাহলে বলতে পারেন, বিড়াল তবে কি? আমি বলব বিড়াল ন্যাকা নয়, আহ্লাদে।

বিড়ালকে আত্মবিস্মৃত হতে বা ভান করতে আমি কখনও দেখিনি। সে 'Nature red in tooth claw'-এর বর্ণনামাফিক হিংস্র। সুবিধার জন্য সে অনেকক্ষেত্রে ভিজে বিড়াল সাজে জলে না নেমে। মানে ভান করে না, ভয়াবহতা গোপন রাখে।

এদিকে গৃহপালিত কুকুর সম্পূর্ণ নিজের চরিত্র খুইয়ে বসে। সে কুকুরের সঙ্গে আর মিশতে পারে না সর্বদা মনুষ্য সাহচর্যে থেকে থেকে। আবার পুরোপুরি মানুষের মতও হয় না, মেলামেশায় বাধা থাকে। তার অবস্থা ঈর্ষাজনক বা সম্মানজনক কোনটাই নয়।

প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে চটাং-চটাং ল্যাজ নেড়ে বিরাট অ্যালসেশিয়ান আসে ন্যাকারা করতে। আমার নিরীহ ভাব অ্যালসেশিয়ানের দলের আস্থা যোগায়। ভালভাবে পোষা অ্যালসেশিয়ান আমার বেজায় পায়ে পড়ে, তাদের মনিববাড়ী আমি গেলে।

আমার এক বন্ধু, যাকে বলে কুকুরের রাণী। ওর স্বামির সারমেয়প্রীতি দেশবিদেশের কুকুরসংগ্রহে দেখা যায়। তিনি ভ্রাম্যমাণ চাকুরিয়া। তিনি স্ত্রীকে নানা উপদেশ দিয়ে যান কুকুর পালন সম্বন্ধে। কিন্তু দীর্ঘকাল ওঁকে বাইরে থাকতে হয়। স্ত্রী যথাসাধ্য দায়সারা ভাবে ঝি-চাকর সাহায্যে পশুপালন করে। কিন্তু হায়, কুকুর ক্ষীণজীবী হয়। আবার একটি আসে।

ওদের অ্যালসেশিয়ান অতি অমায়িক ছিল (সে এখন স্বর্গত)। আমি যাওয়ামাত্র আমার পায়ের কাছে গালিচায় বসতে উদ্যত হত। চট করে পা-টা গুটিয়ে নিতে হত নইলে পায়ের গোছে গা ছেড়ে বসে পড়ে পায়ের হাড়ের দফা সারবে। সেই কুকুরটি আবার মনিবের সঙ্গে ল্যাজ নেড়ে বেড়াতে আসত। যেখানে সেখানে যার-তার ওপর ধপ্ করে বসে পড়া তার মারাত্মক অভ্যাস। সে অভ্যাসে একদিন কি ঘটেছিল বলি।

শান্তির পিত্রালয় থেকে এক চাকর মারফৎ কিছু জিনিস ওর মা পাঠিয়েছিলেন। শান্তিরা স্বামী-স্ত্রী বাড়ী ছিল না। চাকর অপেক্ষায় বসল। বলাবাহুল্য অ্যালসেশিয়ান সেখানে। হঠাৎ বৈদ্যুতিক গোলযোগে আলো নিভল। ব্যস, নীরব ও নিঃশব্দ অ্যালসেশিয়ান একেবারে লোকটির গায়ে চেপে বসল ওকে মাটিতে চেপে ধরে। শান্তি বলত, "প্রিন্সের ব্রিডিং বড্ড ভাল। মাইল্ড স্বভাব।"

তাই আঁচড়-কামড় নয়, ডাকাডাকি নয়। চেপে ধরে রাখ যাতে অন্ধকারে চুরি করতে না পারে।

কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বললে শান্তি ফিরে দেখে কাণ্ড। চাকরের কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি, হাতে গায়ে প্রিন্সের অনিচ্ছাদত্ত নখররেখা। পুরাতন ভৃত্য পিত্রালয়ের। দিদিমণিকে দেখে কেঁদে-কেটে একাকার।

স্বামীর একখানি ভাল ধুতি ঘুঁষ দিয়ে শান্তি চাকরকে ঠাণ্ডা করে।

শান্তি আমাকে বলল : "কি আশ্চর্য, প্রিন্স ওকে চেনে। যতক্ষণ আলো ছিল দিব্যি ছিল। অন্ধকার হওয়া মাত্র চেনা লোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করল কেন ভেবে অবাক হচ্ছি।"

আমি বললাম "ন্যাকামী।"

অপর একটি কুকুরের ন্যাকামীর কাহিনী শুনুন। একটি-দুটি কাহিনী বলে দিলেই আমার প্রমাণবস্তুর দৃঢ়ভিত্তি দেখানো যাবে।

গেছি বিহারে সাহিত্যসভায়।

বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য মিলেছে। এসকর্ট করে নিয়ে গেছেন উভয়পক্ষের পরিচিত এক ভদ্রলোক।

একটি বিরাট কুকুর দেখলাম যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্ধুর কল্যাণে নানারূপ কুকুর দেখা অভ্যাস আছে। ভ্রূক্ষেপ করলাম না।

সন্ধ্যার পর পৌঁছে চা-বিস্কিট খেয়েছি। গৃহকর্ত্রী নৈশভোজনের আয়োজনে অন্যত্র ব্যস্ত।

একটু পরে কুকুরটি ঘরে ঢুকল। আমার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ দরজার বাইরে চলে গেল। আবার ফিরে এল।

আমি কুকুরটিকে এরকম করতে দেখে কিছু বুঝতে পারলাম না। তখন কুকুর দরজার বাইরে দুপায়ে ভর রেখে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। প্রায় মানুষের সমান লম্বা। অতঃপর সে সম্মুখের দুই পা হাতের মত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল, আমরা যেমন 'এসো, এসো' করে ডেকে থাকি। এবার এসকর্ট বলে উঠলেন, "খেতে ডাকছে, চলুন।" তিনি পূর্বপরিচিত, কুকুরের আচরণ রপ্ত করেছেন।

মনে বড় অভিমান হ'ল। আমি বেকার সাহিত্যিক, মিনিষ্টার নই ঠিকই। কিন্তু তাই বলে কুকুরকে দিয়ে খেতে ডাকা?

মন ভার করে গোঁজ হয়ে খাবার ঘরে খেতে বসলাম। নানাবিধ আয়োজনে আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে এধারে। অথচ কুকুরকে দিয়ে—

হঠাৎ কানে এল ভদ্রমহিলার বিগলিত উক্তি। একমাত্র বছর দশের ছেলেকে দেখিয়ে কুকুরকে বলছেন, "যাও, ওঘরে দাদার সঙ্গে খেতে বোসগে।"

কুকুর নির্বিবাদে বার হয়ে গেল, ছেলের সঙ্গে। বুঝলাম কুকুর ভদ্রমহিলার দ্বিতীয় সন্তান ও অধিক আদরের।

কিন্তু তোকে ছেলে বলা মাত্র, তুই কুকুর, ধরে নিলি তুই মানুষ হয়ে গেছিস? একটা চাকরের কাজ তুই করে যাচ্ছিস ন্যাকা সেজে?

পরের দিন সম্মানিত অতিথি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে একখানা ছবি তোলা হল। সকলে দূর থেকে দেখলেন। কুকুর এসে পায়ের কাছ পোজ দিয়ে বসল। একটি লোকও নিষেধ করলেন না। কুকুরের সঙ্গে সেই যুগলমূর্তি এখনও আছে।

পরের দিন যাবার সময়ে সবাইকে ঠেলে কুকুর ছুপায়ের ভরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ীর দিকে থাবা ছুটো নেড়ে নেড়ে আমাকে সী-অফ করল। কি করা যায়? আমাকেও রুমাল নাড়তে হল।

অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাড়ী পার্টিতে পোষা গ্রেট ডেনের আচরণে অতিষ্ট হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

কর্তাগিন্নী চুলোয় গেছেন। রাস্তার ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বার করে গ্রেট ডেন দেখছে গাড়ীর শব্দ পেয়ে। কার্পেটঢাকা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতকে আগু বাড়িয়ে বসবার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। আবার সকলে যাবার সময়ে ঘর থেকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। ওর বিরাট চেহারা ও রাশভারী ধরণ-ধারণ দেখে কেউ আপত্তির সাহস পাচ্ছেন না।

কলকাতার বাছা-বাছা ব্যক্তিকে সেই পার্টিতে, রাদার সেই কুকুরের পার্টিতে দেখেছিলাম। নাম করতে চাই না।

সম্প্রতি এক কুকুরের ন্যাকামির ফলে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়েছি। রোজই ভাবছি কি করা উচিত?

পরিচিত জনের বাড়ী গেছি। চা এল ভারী সুন্দর নূতন দামী কাপে।

সগর্বে গৃহকর্তা বললেন, "নূতন সেট্‌টা দাম দিয়ে কিনে এনেছি। ভাঙা চোরা বেমানান কাপে চা খেতে ইচ্ছা করে না।"

আমি কাপের তারিফ করে চা নিঃশেষ করে সেণ্টার-টেবিলে কাপটা রাখি।

ওই বাড়ীর অ্যালসেশিয়ানও আমার ভক্ত। প্রকাণ্ড শরীরটা দুলিয়ে চটাস-চটাস ল্যাজ নেড়ে আদর করতে এল।

ল্যাজের ঘায়ে টেবিল থেকে নূতন কাপ গড়িয়ে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো। গৃহকর্তা কুকুরকে এক-ঘা বসিয়ে দিয়ে বিলাপ করলেন, "এমন সুন্দর দামী সেট্‌টা গেল বরবাদ হয়ে।"

আমি কি করব এখন?

মানিনী অ্যালসেশিয়ান আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, যেন দোষটা আমারি।

একসেট্ চায়ের পাত্র কিনে ওর মুখের সামনে ধরে দেব? না ওমুখো হবনা আর?

শীতের কমলালেবু, ফুলকপিঘেরা দিনে মনে পড়ে যায় আগে কলকাতায় আরও কত উৎসব-আনন্দের ব্যাপক আয়োজন হত। সার্কাসের বিরাট তাঁবু পড়ত, সেজে দাঁড়াত কার্নিভাল্।

বিদেশীশাসনে শাসিত বাংলাদেশে শাসকদের রুচি অনুযায়ী প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা। বড়দিন সত্যই বড়দিন, বৃহৎ ব্যাপার। অবিভক্ত বাংলার জমিদারশ্রেণী আসতেন শহরে, আনন্দ উৎসব উপভোগ করে নিতে। এক অর্থে দুর্গাপূজার থেকেও গুরুত্ব পেত যীশুখৃষ্টের জন্মদিন তখন।

বনেদী হিন্দুঘরে দুর্গাপূজার মহোৎসব চলত অবশ্যই। পথেঘাটে সমারোহ, জম-জমাট। গ্রাম্য জমিদার গ্রামেই উৎসব করতেন। কলিকাতার পূজা-সমারোহ কয়েকদিনের জন্য শহরকে সেকেলে ভাষায় ইন্দ্রের অমরাপুরী বানিয়ে দিত।

আরও দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গবঙ্গ উৎসব ছিল ক্রিসমাস। সে-সময়ে ইংরেজ-প্রীতিপ্রদ নানাবিধ অনুষ্ঠানে ভরে যেত শহর। সেই সময়ে স্বাভাবিকভাবেই দেশী থিয়েটারও বাড়তি জৌলুষে কাছে টানতে চাইত দর্শকবৃন্দকে।

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে দীর্ঘ ছুটি। সময় হাতে আছে সকলের। খৃষ্টের জন্মদিবসআমরা বিধর্মীহয়েও যেরূপনিষ্ঠায় পালন করেছি, শুধু এই একটি উদাহরণ দ্বারাই আমাদের উদারতা ও

সার্বজনীন মৈত্রী বোঝানো যায়। এখানে ঈশ্বরকে একটু সামান্য ধন্যবাদ দিয়ে রাখি যে তৈমুর, আলেকজাণ্ডার, রসপুটিন, এঁদের প্রতি আনুগত্য বা শ্রদ্ধা দেখাতে হয়নি ভাগ্যক্রমে। মহামানবকেই পেয়েছিলাম।

থিয়েটারও দীর্ঘ চমকপ্রদ সূচী খুলে দিত নূতন নূতন নাট্য-প্রয়াসের। বিভিন্ন মঞ্চ থেকে আনত বাছা-বাছা অভিনেতা ও অভিনেত্রী একত্রিত অভিনয়ের উদ্দেশে।

মনে আছে শীতকালে আমার বড়কাকা আসতেন গ্রামের আওতা ছেড়ে। মোড়ের বাড়ীগুলোর গায়ে পড়ত হরেক রংয়ের কালিছাপা বৃহৎ প্রচারপত্র। পোষ্টার দেখবার জন্য আমার ছোড়দা ছুটে যেতেন গরমকোট গায়ে। দেখে আসতেন কোন্-কোন রঙ্গমঞ্চে কোন্ কোন্ নাটক নামানো হচ্ছে।

থিয়েটারগুলির নামও মনে আছে : 'মনমোহন', 'মিনার্ভা', 'স্টারথিয়েটার' ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে শিশিরকুমার এলেন যুগপ্রবর্তক হিসাবে। সার্কাস, কার্নিভালের দর্শক-সমাবেশ আকৃষ্ট হত কলকাতার থিয়েটারে। থিয়েটারওয়ালা তো পেছিয়ে থেকে গোটা বড়দিনের বাজার ফিরিঙ্গী আনন্দের হাটে তুলে দিতে পারতেন না। তাঁর ব্যবসায়বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠত। তিনিও বড়দিনের আমোদের প্রচুর যোগাড় করে দর্শককে আহ্বান করতেন।

ঘরে ঘরে পোষ্টার থিয়েটারের লোক বিলি করে যেত। লম্বা পটের মত পাতলা কাগজে লাল-নীল-সবুজ-কালো বড় হরফে নাটক ও নেতৃবর্গের নাম। নায়িকাদের নামের পূর্বে কিন্নরকণ্ঠী, নাট্যসম্রাজ্ঞী ইত্যাদি, অভিনেতার নামের পূর্বে নাট্যসম্রাট, নটসূর্য ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণে দর্শককে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চলত।

কখনও বা মাথা-গলিয়ে বোর্ডে-আঁকা পোষ্টার গায়ে পরে লোক হেঁটে যেত রাস্তায়।

শীতকালে, বড়দিনে থিয়েটার দেখব না তো কি? কলকাতার গৌরব কলকাতার বাঁধা এতগুলি মঞ্চ। সপ্তাহে তিনচারদিন অন্ততঃ অভিনয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা, যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেই।

ডাকা হত ঘোড়ার গাড়ী। ট্যাক্সি সীমিত ও আক্রা ছিল। ফীটানে অল্পলোক ধরত, থার্ডক্লাশ ঘোড়ার গাড়ী অপাংক্তেয় ছিল সভ্যসমাজে। '।।।' টানা দুটি মরকুটে ঘোড়াবাহিত গাড়ী বোঝাই করে যেতেন থিয়েটার দেখতে পানহাতে নেহাৎ ছাপোষা গৃহস্থ।

একটু ভদ্র ও সতেজগোছের একটা ঘোড়া বেড়াত '।।' গাড়ী টেনে। সেই গাড়ী চড়ে আর একটু উচ্চতাভিলাষী থিয়েটার দেখতে যেতেন।

প্রায়ই তখন থিয়েটারের সঙ্গে একখানা গীতিনাট্য জুড়ে দেওয়া হত বিশেষ রজনীর অনুষ্ঠানের যথা, কিন্নরী, অপ্সরী, ফুল্লরা ইত্যাদি। নৃত্যগীতপটিয়সী সুচেহারার অভিনেত্রী অভিনয়ে খাটো হলেও এখানে সমাদৃতা।

সারা রাত্রিব্যাপী প্রমোদের লোভ দেখিয়ে রাত্রিজাগরণ সহজ করে দিত থিয়েটার। খাবারদাবার, জল, বাচ্চার দুধ ও বাচ্চা, কাঁথা-কাপড়, প্রকাণ্ড ডিবে-ভরা সাজা পান সঙ্গে যেত। আহারাদি যোগাবার ফলাও ব্যবস্থাও ছিল থিয়েটারভবনে। যাঁরা দোতলায় স্ত্রীকে আক্র রেখে আলাদা আসনে বসাতেন, তাঁরা প্রকাণ্ড শালপাতার ঠোঙ্গা ভরে বাজারে খাবার এবং মিঠেপানের দোনা থিয়েটারের ঝি মারফৎ পাঠাতেন। ঝিয়েরা তারস্বরে হেঁকে হেঁকে 'ওগো, অমুকের বাড়ী, ওগো ওমুক ডাঙ্গার দত্তবাড়ীর গো'— ইত্যাদি ভাষণে খাদ্যদ্রব্যাদি পৌঁছে দিত।

সেইসব থিয়েটারের ঝি গেল কোথায়? বিধবার একাদশীর মত, সধবার শাঁখাপরার মত তারা বিলুপ্তপ্রায়। ঝক্‌ঝকে-তকতকে

একহারা থিয়েটার, বড়জোর বক্স থাকে, আর ব্যালকনি থাকলেও থাকতে পারে। মহিলাদের পৃথক আসনের সংরক্ষিত ব্যবস্থা কোথায়? মহিলাদের পৃথক আসনে থিয়েটারে যাইনি, যেতে হয়নি। ডাইনোসেরসের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। একবার শুধু প্রথম ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালে রূপবাণীতে টিকেট না পেয়ে দোতলায় মহিলাসনে বসে জাপানী ছবি একখানা দেখেছিলাম। আমার সমপর্যায়ের বহু মহিলাও গেছেন সেখানে। মহানন্দে রাজা-উজীর মেরে মেরে আমরা ছবিখানা দেখেছিলাম। কেউ ভ্রুকুটি করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়নি, কেউ বিরূপ মন্তব্য পাস করেনি অথবা চুরোটীকাধূম্র (এখন নিষিদ্ধ) নিক্ষেপ করেনি।

ফল ভালো ছাড়া মন্দ হয় না।

ট্রামে বাসে মহিলাসন আছে, লেডিজ ট্রাম আছে। চলছে বেশ।

ঘুমভরা চোখে, ফ্রকপরা বাচ্চাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হত থিয়েটারে। কারণ, বাড়ীতে রেখে যাবার মত লোক ছিল না।

কখনও ঘুমিয়ে থাকতাম। জেগে উঠে দেখতাম জরির চমক,নকল মুক্তামালার দোলন,খোলা তলোয়ার। আবার হারিয়ে যেত তারা।

একবার ঘুমের ঘোরে চেঁচামেচি শুনে চেয়ার থেকে মাথা তুলে চেয়ে দেখলাম একজন সমর্থ পুরুষ আর একজন বেশ বড়োসড়ো যুবককে জড়িয়ে ধরে কি সব বলছেন, দুজনেই হুমড়ি খেয়ে সাজানো দৃশ্যের সিঁড়ির ধাপে পড়ে গেছেন। এধারে প্রেক্ষাগৃহে চটাপট হাততালি।

ড্রপসীন ঝুলে গেল, আমিও ঝুলে পড়লাম। পরিণত বয়সে সেই নাটক দেখবার সময়ে বুঝেছিলাম, কি দেখেছিলাম সেদিন। 'শিশিরকুমারের অনবদ্য অভিনয় 'সীতায়' লবকে জড়িয়ে ধরে—

'কার কণ্ঠস্বর?—

—তবে তুমি সীতার তনয়?'

কিন্তু প্রাচীন যুগের থিয়েটার সকলের কাছেই স্বপ্নে-ঘেরা ছিল। সিনেমা, নির্বাক বা টকী, তখন থিয়েটারের ভূমি জবর-দখল করেনি।

থিয়েটার প্রধানতঃ ছিল উত্তর কলকাতায়। দক্ষিণের পক্ষে সুদূর দেশ। সময় লাগত বহুক্ষণ। রাত্রিজাগরণ নবপর্যায়ের থিয়েটারে প্রয়োজন না হলেও সময় লেগে যেত বেশী বেশী। টিকিটের মূল্য সিনেমা অনেক সুলভ করেছিলেন। মাত্র আট আনায় সুখপ্রদ ও সংরক্ষিত আসন পাওয়া যেত প্রথম যুগে।

তদুপরি থিয়েটারে যা দেখানো সম্ভব ছিল না তৎবৎ দৃশ্য সিনেমায় অনায়াস আয়ত্ত : থিয়েটারের নায়িকা অপেক্ষা সিনেমার নায়িকা অনেক রূপসী। নির্বাক যুগে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান নায়িকার কমনীয় রূপমাধুর্যে সকলে মুগ্ধ ছিলেন।

নানা চটক দেখিয়ে সর্বত্র সিনেমাহাউস খুলে দিয়ে চলচ্চিত্র স্থান করে নিল। সুন্দর মুখের জোরে অভিনয়ে দক্ষ না হলেও কতজন হিরো বা হিরোইন হয়ে গেলেন! গলা তোলার শ্রম নেই, হাজার হাজার দর্শককে শান্ত রাখার আতঙ্ক নেই, দুর্গ জয় হয়ে গেল।

সিনেমার প্রথম যুগে তো গলাটি ভাঙ্গা হলেও মুখ না খুলে নায়ক-নায়িকা হওয়া যেত।

সময় ও শ্রম দুই-ই কম, স্বাতন্ত্র রাখা চলছে। অতএব ভদ্রঘরের কেউ কেউ নেমে গেলেন চিত্রে।

সিনেমা অভিজাত হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল ডানামেলা পরী, মুখোসধারী রাক্ষস? স্টেজভরে সখীর দলের নাচ? গানে-গানে ভরা নাটকগুলো? রাজার তলোয়ার, রাণীর মুকুট, সন্ন্যাসীর দাড়ি, বাউলের গেরুয়া? কত আয়োজনে আকর্ষণকারী থিয়েটার।

আধুনিক নাটকে অনাড়ম্বর রূপ এলেও রক্তমাংসের মানুষ

চোখের সম্মুখে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এ এক চরম বিস্ময়, নয় কি ?

তার কাছে সিনেমা যেন মোগলাই রোষ্টের পাশে ফিকে সিঙ্গী মাছের ঝোল। দয়া করে সিনেমা-কর্তৃপক্ষ আমার অপরাধ নেবেন না। থিয়েটারের যুগে যাদের শৈশব কেটেছে, তারা অবচেতন মনে একটা বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে।

থিয়েটার আছে এখনও। নানারূপ প্রয়োগকৌশল ও মঞ্চ-কৌশল দেখানো হয়। কিন্তু শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, দানীবাবুর অভিনয় কোথায় ? কোথায় তারাসুন্দরী, নীহারবালা, আঙ্গুরবালা, কুসুমকুমারী ?

অতি-নাটকীয় অতি-অক্ষম নাটকও যাঁরা চোখের সামনে মুহূর্তে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারতেন, তাঁরা আজ নেই। মানুষের মনের অতি স্থূল, তীব্র ভাবলহরী নিয়ে যাঁদের অভিনয়গুণে স্থূল ক্রিয়াকলাপ প্রাণমন্ত্রে মূর্ত হয়ে উঠত, তাঁরা থিয়েটারের হারানো দিনগুলির মতই হারিয়ে গেলেন।

ক্ষীণকণ্ঠেই মাইক দরকার হয়। অতিবড় সুন্দরীও বিশ্রী সজ্জায় শোভামানা। তাই সেদিন ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়ের উৎকর্ষে অভিনেতা থিয়েটারকে অপূর্ব গরিমা দিয়েছিলেন। সেই সুবর্ণময় বিগত থিয়েটারের যুগ স্মরণে মন আকুল হয়ে ওঠে।

—:***:—

আমি ছেলেবেলায় অনেক যাত্রা দেখেছি।

কলকাতায় আধুনিক সুইচ্চ ঘোষণায় যাত্রাকে যাত্রা বলে অভিনয় করা হয়। কিন্তু যেই পাবনা জেলার গণ্ডগ্রামে যাত্রা ছিল থিয়েটারের সমপর্য্যায়।

আমি অবশ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মঞ্জরী অপেরার' মত মেয়েযাত্রা দেখিনি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' নামক গল্পের বর্ণিত অপরূপ যদু হাজরাকেও দেখিনি। তবু যা-যা দেখেছি, তার মধ্যে একজন অভিনেতার কথা এখনও মনে আছে।

যাত্রা আসত বড় বড় ষ্টীলের তোরঙ্গভর্তি পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে। আমাদের কৌতুহল ছিল ওখানে। সারি-সারি বাক্স বোঝাই গরুর গাড়ী হেলে-দুলে সড়কে প্রবেশ করছে। সাধারণতঃ পূজার সময়ে বা ঠিক পরেই যাত্রা বসত। কারণ বিদেশ থেকে আমরা তখন পূজোয় যোগদান করতে বাড়ী যেতাম।

প্রধান অট্টালিকার সামনে খোলা মাঠের কাছারীবাড়ীর উল্টোদিকে একট বড়ঘরের আটচালা ছিল। সেখানে ওদের মাংস রান্না হত, সাজের বাক্সগুলো থাকত। ওই বিরাট ঘরটিও সাজঘর হিসাবে ব্যবহার করা হত। পরদা খাটিয়ে লম্বা সরু ঢাকা রাস্তা দিয়ে খোলা আসরের সামিয়ানার নীচে ওরা চলে

আসত। বেশীর ভাগ সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় চলত। কখনও এক দুখানা চেয়ার পেতে দিত।

রাত্রিবেলা হ্যাজাক ও গ্যাসের বাতির আলোয় আসর বসত। চেয়ারের সারির পেছনে ঢালা ফরাসে দর্শকজনের ব্যবস্থা।

উজ্জ্বল আলোয় ঝকমকে পোষাকপরা সেই অভিনেতাদের মনে হত অমরকুল। মেয়ের ভূমিকায় সাজ-পোষাকে তাঁরা নারীকে হার মানাতেন। কখনও ব্রীড়ামিশ্রিত ছলাকলার অভিনয় দেখে দর্শকমধ্যের মহিলাকুল পরস্পরের গা টেপাটেপি করে কৌতুক-হাস্য বিনিময় করতেন, কখনও বা লজ্জিত হতেন।

অসম্ভব নানা কাহিনী শুনতাম গদ্য বা পদ্যে। অতি কৃত্রিমতা-পূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গি।

একটি নাটকের কথাই বলতে বসেছি যতটুকু মনে আছে।

একজন রাজা দরবারকক্ষে একজন সেনাপতিকে বন্দী করার আদেশ দেন। কারণ মনে নেই। শৈশবে শুনেছিলাম কি না।

সেনাপতির হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে প্রহরীরা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সভা থেকে।

সেনাপতি সরোষ ব্যাঘ্রের মত তাকাচ্ছেন ফিরে ফিরে অতি কঠোর দৃষ্টিতে। ফিরে ফিরে আসছেন শিকলশুদ্ধ রক্ষীদের টেনে নিয়ে।

লোক তাঁর ভাবপ্রকাশ দেখে হাততালিতে ফেটে পড়ল। দীর্ঘ চেহারা, তাম্রবর্ণ রং মেকাপেও গৌর হয়নি। চৌকো-গোছের দৃঢ় চোয়াল-সমন্বিত মুখ। অতি প্রশস্ত বক্ষে কয়েকটি পদক। সেকালে যে যত মেডেল পেত, বুকে ঝুলিয়ে নামত মঞ্চে। সে দৃশ্য দেখে দর্শক অভিনেতার নাম-যশ সম্পর্কে অবহিত হতেন।

ভদ্রলোকের অভিনয়ে ধন্য-ধন্য রব পড়ে গেল। শুনলাম যে ইনি পার্টির মেশানমাষ্টার।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। অবশেষে আবার একদিন দেখা মিলল।

সেই যাত্রার আসর। উক্ত নাটকখানি ভাল লেগেছিল বলে আজ আবার উক্ত বইটি নামানো হয়েছে। আমি সদ্য আধুনিকার উন্নাসিক অবজ্ঞাভরে বসেছি যাত্রার আসরে। মনে কৌতূহলও প্রচুর। অনেক বৎসর আগের সেই মোশানমাষ্টারের সেই ভূমিকা এখন কেমন হয় তাই দেখবার আগ্রহ আছে।

নামল সেই দৃশ্য।

সেইভাবে পুরাতন ভূমিকায় পুরাতন অভিনেতা উপস্থিত হলেন মঞ্চে।

আমি বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে দেখছি।

উজ্জ্বল ডে-লাইটের আলোয় সেই মোশানমাষ্টার নেমেছেন অভিনয়ে। সেই পুরাতন ভঙ্গি।

তাম্রবর্ণ এখন কৃষ্ণ। দেহ ন্যুব্জ না হলেও খাড়া নয় পূর্বের মত। বক্ষে সারি সারি রূপোর মেডেল ঝোলানো থাকলেও বক্ষস্থল পটসদৃশ নয়। বক্ষে সারি সারি পদক থাকলেও বহু-দিনই হয়তো নূতন কিছু যুক্ত হয়নি।

আমাদের চোখের সম্মুখে সেই পুরাতন ছন্দের অভিনয়। এবার শ্রোতাবৃন্দের মুখে অসহিষ্ণু গুঞ্জন, বেশী বেশী হয়ে যাচ্ছে।

অভিনেতার শৃঙ্খলাবদ্ধ যাতায়াত মোশানে হাস্যকর লাগতে লাগল। এককালে যে ভঙ্গির জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত, এখন তিনি সেই চিরাচরিত ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন, আশা মিটছে না তাঁর মোশান দেখিয়ে।

শীর্ণ-দেহী আজ মোশান-মাষ্টার। শৈশবে আমার স্বপ্নভরা চোখে যা দেখেছিলাম, আজ শ্রীহীন লাগছে কেন? এ কি মোশানমাষ্টারের বিগত যৌবনের জন্য, অথবা আমার প্রথম দেখা রোমান্টিক কল্পনার সমাধি হয়েছে সেজন্য?

দর্শক জনতা অসহিষ্ণু।

ঠিক কথা। প্রাচীন অভিনেতার প্রাচীন ভঙ্গি ভাল লাগে না আর।

কিন্তু মোশান-মাষ্টারের দোষ কি ?

বিগতযুগের অভিনেতাকে যদি মুখে রং চড়িয়ে এখনও নায়কের পার্ট করতে হয় বাধ্য হয়ে, তবে দোষ কার ?

অবশ্যই মোশানমাষ্টারের সখে এ ঘটনা ঘটেনি। তার উপার্জনের অন্য পথ ছিল না এবং উপার্জনেব প্রয়োজন ছিল। ছ্যাকড়াগাড়ীর ঘোড়ার মত তাকে যদি ভাড়াগাড়ী টেনে চলতে হয়, যদি নিশ্চিন্ত আরামে দুমুঠো যোগাড় হবার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সে অপরাধ রাষ্ট্রের, সমাজের।

আমরা স্বাধীন হলাম কেন ?

শিল্প-সাহিত্য এমন বস্তু যা হাটে সর্বদা বিকোয় না। তাই চিরকাল শিল্পীর, কবির মুরুব্বী বা পেট্রনের সহায়তা লাগে। যাত্রাদলের এক বৃদ্ধ অভিনেতার পেট্রন থাকবার কথা নয়, জানি। কিন্তু ভদ্রজনোচিতভাবে তার বৃদ্ধ বয়সের কোন ব্যবস্থা করা উচিত, অবশ্য উচিত।

কে করবে ?

কেন, যাঁরা শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির দাবীর মিছিল, মহার্ঘ্য ভাতা দাবীর শ্লোগান ইত্যাদি পরিচালনা করেন, জগতের পশুক্লেশ, পশুবলি, পণপ্রথা নিবারণে মাথা ধরিয়ে ফেলেন, বলি, তাঁরা কি এককাপ চা খেয়ে গলা তুলে আমাদের মোশান-মাষ্টারকে এক মুহূর্তে অমরত্ব দিতে পারেন না, একটি প্রতীক বা সিম্বল রূপ দিয়ে তার ? বলুন, সারা জীবন মোশানমাষ্টার শুধু মোশান দেখিয়ে যাবে সে পারুক না পারুক, এ কি হতে পারে ? বিবর্ণ পোষাকে তালি পড়ে, রং খড়ির গোলায় রূপান্তরিত হয়, ডে-লাইটের

জ্যোতি কমে। সতরঞ্চি সামিয়ানা ছেঁড়া, দর্শকেরা অসহিষ্ণু তবু, মোশানমাষ্টার, তুমি তোমার মোশান দেখিয়ে যাবে নিরন্তর? একদিন যা মধুর ছিল, আজ তা কটু-তিক্ত, যে রূপের ছোঁয়ায় তুমি একদা হয়েছিলে অপরূপ, সে সকল কোথায় মিলিয়ে গেছে! মোশানমাষ্টার, শুধু তুমি আর আমি পড়ে আছি। আসরে অবসন্ন তুমি, দর্শকের আসনে ক্লান্ত আমি।

—:***:—

পাঠক, প্রাচীন কলকাতাকে ভুলেছেন কি? না, 'হুতোম প্যাঁচার নকসার' কলকাতা নয়। সেই যুগের বড় বেশী কেউ আমার এ রচনা পড়বার জন্য নেই। আমি বলছি, এই কিছুদিন আগের কলকাতা, ধরুন ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের কলকাতা।

অবশ্য তখন ঘোড়াটানা ট্রাম ছিল না, তবে ছিল রাস্তায় দুধারে গ্যাসবাতি। এখনও অনেক অনুন্নত ছোট রাস্তায় দেখা যায় গ্যাসের দীপ্তি মধ্যে মধ্যে। সন্ধ্যা হতে মই-ঘাড়ে লোক এসে মই বেয়ে চারকোণা বড় কাঁচের ডোমে আলো জ্বালিয়ে দিত

লোহার থাম বেয়ে উঠে। তন্ময় হয়ে দেখতাম। স্বয়ংক্রিয় বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বহুলোকের কাজ গেছে, বহু লোকের কাজ দেখার আনন্দও গেছে।

তখন আসত ভিস্তিওয়ালা। নিয়মিত বিকেলবেলায় পিঠের মসকের মুখ খুলে রাস্তা ভিজিয়ে ঠাণ্ডা করে দিত। তাছাড়া বাড়ী-বাড়ীও জল সরবরাহে তাদের অবদান ছিল। নিষ্ঠাবানেরা অবশ্য গঙ্গাজল কলসীপ্রতি দু-চার পয়সা দিয়ে এনে নিতেন। গঙ্গা যোগাবার বাঁধা লোক থাকত। কতকগুলি লোকের বৃত্তি মিলত এভাবে। এখনও অনেকে বাঁকে করে জল আনেন ফ্ল্যাট-বাড়ীর জলকষ্টে। কিন্তু লুপ্তপ্রায় হয়ে চলেছে এসব।

ফুলের মালা ফেরি বা ফুলের চালান মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার দরজায় দরজায় 'চাই বেল ফুয়েল', 'চাই চাঁপা ফুয়েল' শোনা যেত দরাজ কণ্ঠে। দক্ষিণ কলকাতায় মজদেশীয়ার চাহিদায় বাড়ী বাড়ী ফুল আসে, কিন্তু ডাকের ধরণে প্রভেদ। একটি বস্তু কিন্তু আর দেখি না—ফুলের পাখা। এখন দক্ষিণ-দেশীয়াদের সাপ্লাই যোগান হয় বেলফুলের বেণী, ফুলের পাখা কই? চাঁপা ফুলে, বেলফুলে গাঁথা গোলাপবসানো ছোট ছোট পাখার বিলাসে মুগ্ধ ছিলাম তখন।

রাস্তার পীচে জল পড়ে কেমন গন্ধ উঠত। বিকেলে তারপর চলত ফুলের পাখার ফেরি, পাখাবরফের ফেরি। পাখা-বরফেরও জাত গেছে। এখন ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর। একমুঠো বরফ ন্যাকড়ায় ভরে চ্যাপ্টা করে পিটিয়ে কাঠ ঢুকিয়ে লাল-গোলাপী সিরাপে সিঞ্চিত করে হাতে দিত, চুষে খাওয়ার মজা।

'হাপি বয়' নামক আইসক্রীমের ঠেলাগাড়ী দেখা দেবার আগে ছিল কুলপীবরফ। মাটীর হাঁড়ি মাথায় সেই অকৃত্রিম দেশী কুলপী নিশ্চয় অনেকে খেয়েছেন। টানের পান-আকৃতির

চোঙ্গা থেকে বার করে দিত। কোথায় লাগে ওর কাছে কোয়ালিটি, কেরিনি. ম্যাগ্‌নোলিয়া। অবাঙালী দোকানের অধুনাতম কুলপীও সেই প্রাচীন কলকাতার মাটীর হাঁড়ির কুলপীর কাছে পরাস্ত। সে কুলপী এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায় হয়তো। আলুকাবলি, নকুলদানা ছিল প্রচুর, হরেকরকমের সঙ্গে। 'গরম মুড়ি' কিন্তু এভাবে, মাখা অবস্থায় ফেরি হত না। 'মুড়ির চাক' 'চিঁড়ের চাক্' বলে মোয়া বিকোত। গোলাপী রেউড়ি, 'বুড়ীর পাকা চুল' নামক মিষ্টির জন্য ছেলেপিলে পাগল। আলুনারকেলের ঘুগনি, পাঁঠার ঘুগনী ফেরি হত পথে। তখন' এত রেষ্টুরেণ্ট ছিল না। পথেঘাটে খাদ্যদ্রব্য খুবই ফেরি চলত। কেক্ বরঞ্চ দুর্লভ ছিল কিছুটা। আর মিষ্টান্নের দর ছিল অপরিসীম সস্তা।

দূর ভুলে-থাকা দিন থেকে প্রাচীন কলকাতা মনে স্মরণের বাতাস বওয়ায়, বলে দেয়, কত কি নূতন নূতন বস্তু এনেছিলাম, মনে আছে ?

বাসের রাস্তায় এক এক খানা করে নিত্য নূতন বাস। সেগুলোর নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, যথা দে ছুট, উর্বশী, মেনকা, পক্ষীরাজ, পুষ্পরথ ইত্যাদি। এখনকার বাসের মত নাম্বার-সর্বস্ব নৈব্যক্তিক যান নয়। নিত্য নূতন নাম, নিত্য নূতন সাজ।

সৌখিন লোকের মোটার ছাড়া ঘোড়াগাড়ীরই চল ছিল। ছ্যাকড়াগাড়ী একঘোড়ার, দুই ঘোড়ার ছাড়া অভিজাত ফীটান। ধনীর নানা আকৃতির, নানা ঘোড়াটানা গাড়ী। ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, পাল্কীগাড়ী, জুড়ি ইত্যাদি এক বা জোড়া ঘোড়া টানা। সে কি চেহারা ঘোড়ার! দেখার মত।

আমি অতি শৈশবে পাল্কী দেখেছি, বাহক স্কন্ধে। রিকসার মত ভাড়া করা যেত। কিন্তু তখনই সে প্রাগৈতিহাসে পর্য্যবসিত প্রায়।

টেলিফোন কম দেখা যেত—খুবই কম। সমস্ত বাড়ীতে বিজলি ছিল না। টিউব ওয়েল দেখিনি তেমন আগে। কলের জলই চূড়ান্ত।

মেয়েরা লম্বা ঘোড়া-টানা বাসে স্কুল কলেজে যেতেন বেশ রক্ষণশীলভাবে। আমিও গেছি। ব্রাহ্মিকাধরণে শাড়ীপরা ফ্যাশন ছিল, হবলও ছিল, কম। চিকন ও লেস বহুল প্রচলিত ছিল। জামার হাতায় কখন ঝুলত, গলায় লেসের ফ্রিল। কাঁধে নানারূপ ক্রচ আঁটা, ছোট মেয়েদের কিতের বো-বাঁধা বেণী, বড়দের মোজা ভরে প্রকাণ্ড এলোখোঁপা আধুনিক সমাজে রেওয়াজ ছিল। এখন আমরা যেন ক্রমেই কোনো নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছি।

বনেদী গোঁড়াঘরের মেয়েদের বেণীগাঁথা খোঁপায় বেলকুঁড়ি, জাল, বাগান দেখেছি। টায়রা বা সিঁথি চলত দারুণ। গহনা-গুলো অনেক ফিরে এলেও যখন তখন তাবিজদোলানো বাহু, সাপআংটি, সাপনেকলেস, আড়াইপ্যাঁচ দেখা যায় না।

শাড়ীতে বাহলার কাজ প্রসিদ্ধ ছিল। টাঙ্গাইলের শাড়ীর মিহি খোল, শান্তিপুরীর জড়ির কল্কা যেন এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। জংলা বেনারসী, ঢাকাই-এর তুলনা ছিল না।

ঢাকাই এখনও মনোহর। সীমান্ত পেরিয়ে আমরা যা যা এনেছি, সুন্দর হলেও তখন যেন আরও সুন্দর ছিল। তাঁতীর ঘরে ঘরে তখন বস্ত্রশিল্পের অনবরত অনুশীলন উৎকর্ষ দিয়েছিল নিশ্চয়।

প্রথম শাড়ী আমার খয়েরী ঢাকাই, জড়ির বুটীদার। মাসীমার বিবাহে প্রথম শাড়ী পরব বলে বিয়ের দিন সন্ধ্যায় মামার বাড়ীতে দ্বারে উৎকর্ণ প্রতীক্ষায় আছি। বাবা দোকান থেকে শাড়ী কিনে এনে দেবেন। ফ্রক ছেড়ে প্রথম শাড়ী পরব। সেই ছোট শাড়ী-খানির রূপমাধুরী এখনও স্মরণে মুগ্ধতা ধরে রেখেছে। বাবা

হাতে দিলেন প্রথম শাড়ী ঢাকাই। এখনও ঢাকাই শাড়ী দেখলে মনে আপনা থেকে পুলক জাগে।

কিন্তু, বিচক্ষণ পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে একটু হাসি গোপন করতে চাইছেন। সেইসব মুগ্ধতা বস্তুপুঞ্জের উৎকর্ষ হেতু নয়; সে মুগ্ধতা আমাদের বিনষ্ট যৌবনের।

স্কুলে উৎসবে কমলালেবু, কেক, সন্দেশ হাতে হাতে দেওয়া হত। থিয়েটারের বড় বড় প্ল্যাকার্ড যেখানে সেখানে দেখা যেত। নির্বাক ছিল সিনেমা অনেক যুগ, অনবদ্য সুন্দরী মৌনা নায়িকার রহস্য নিয়ে। হিন্দু-বাড়ীতে কড়িখেলার ছড়াছড়ি, ইঙ্গ-বঙ্গ বাড়ীতে তাস। ঘরে ঘরে রং ও রূপ। রূপের পেছনে যৌবন হাঁটত, যৌবনের পেছনে রূপ নয়।

অনেক অনেক সময় ছিল সকলের। আড্ডা-দেওয়া একটা মানসিক চর্চার প্রকৃষ্ট রূপ বলে গণ্য হত। রবীন্দ্রনাথের সময়ে শুধু নয়, আমাদেরও শৈশবসময়ে। বিনা কারণে মানুষ খবর নিতে, গল্প করতে আসত।

তখনকার লোকে কম কাজ করতেন না, কিন্তু কোথাও তাড়া ছিল না। জীবনযাত্রা নিরাড়ম্বর ছিল এখনকার চেয়ে, যুগযন্ত্রণা গ্রাস করে ধরেনি। তাই দিনের পালের হাওয়ায় আরামের আমেজে নগর গা ভাসিয়ে দিত সানন্দে।

নীয়ন-লাইটের যুগ নয়, গ্যাসের নরম আলোয় উজ্জ্বল রাস্তায় গঙ্গার বৈকালী হাওয়ায় অভিষিক্ত রাজপথের অল্প কয়েকটি গাড়ী-চলা দেখতে দেখতে কুলপী বরফের ডাক শুনে ফুলের পাখার গন্ধে বিহ্বল একটি মেয়ের মনে এই ইঁটকাঠের শহরের প্রতি দুর্বার প্রেম জন্ম নিয়েছিল। পদ্মাপড়ের জন্মভূমি প্রেয়সী হতে পারেনি, শুধু ধরণী হয়ে দূরেই ছিল।

দোলে রংঝরা পিচকারি বৈঠকী গানের আসর, বিজয়ায় সিদ্ধির সরবৎ নিয়ে কলকাতা জব চার্ণকের স্বপ্ন দেখত কি না

জানি না। শৈশবে পরাধীনতার গ্লানি বা জ্বালা বোঝার বয়স হয় নি। আমরা নির্বোধ আনন্দে মশগুল হয়ে শীতে আলষ্টার পরে গলায় ভেলভেটের কলার হাতে ভেলভেটের কাফ লাগাতাম। অর্গাণ্ডি-ভয়েলের শাড়ী পরে শাদা বাকস্কিনের বেবীশু পায়ে টগবগ করে স্কিপিং রোপে লতাপাতা কেটে স্কিপ করতাম। বড়দিনে আলোকসজ্জা, নীল-লাল কাগজের শিকলিসজ্জা দেখে শিকল পরার ক্ষোভ ভুলে থাকতাম। বড়দিনে হাতে হাতে কেক-কমলালেবু মিলত। ছুটে যেয়ে পেষ্ট্রী আইসক্রীম খেতাম তারিয়ে তারিয়ে। সার্কাস এলে দেখা চাই-ই। আর ঘোড়ারগাড়ী বোঝাই করে গঙ্গাস্নানে যেতাম নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হিসাবে গুরুজনদের সঙ্গে। কপালে মুখে শীতল চন্দনের ছাপকাটা মনে পড়ে এখনও।

বিয়ের বর যেত ময়ূরকণ্ঠি চড়ে, বড়লোক হলে বাজনা-রোশনাই নিয়ে শোভাযাত্রায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে জেলেপাড়ায় সং দেখার আশায় হ্যারিসনরোডে ভিড় করতাম মামার বাড়ীর ছাদে। পয়লা বৈশাখে বাড়ীর পাশে শরৎবাবুর মনোহারি দোকানের মিষ্টি তো বাঁধা আছে-ই।

নগ্নপায়ে নিত্য প্রত্যুষে টোলের ছাত্ররা স্তোত্রগান গেয়ে গঙ্গা স্নানে যেতেন বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে। এক পয়সায় ছুটো বিরাট মাছ লঞ্চেস চুষে চুষে মোড়ে বড়-বড় ক্যারাভান গাড়ী থেকে সরবৎ বেচা দেখতাম। গাড়ীগুলোকে 'ঘরগাড়ী' বলতে যেয়ে বলে ফেলতাম 'ঘরের গাড়ী'।

অতি প্রাচীন কলকাতা না দেখতে পেলেও যা আমি দেখেছিলাম তা তো আর নেই। কি যেন একটা তখন ভাসত আকাশে বাতাসে ফুলের গন্ধের মত। সহৃদয়তার উত্তাপে ভরা মধুরিমা সিঞ্চিত মেজাজী আবহাওয়া। সেদিনের সেই কলকাতা হারিয়ে গেছে। যে-মেয়েটি সেই কলকাতাকে ভালবাসত, সে-ও হারিয়ে গেছে।